কিশোর কাহিনি সিরিজ

গুপ্তধনের গুজব

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

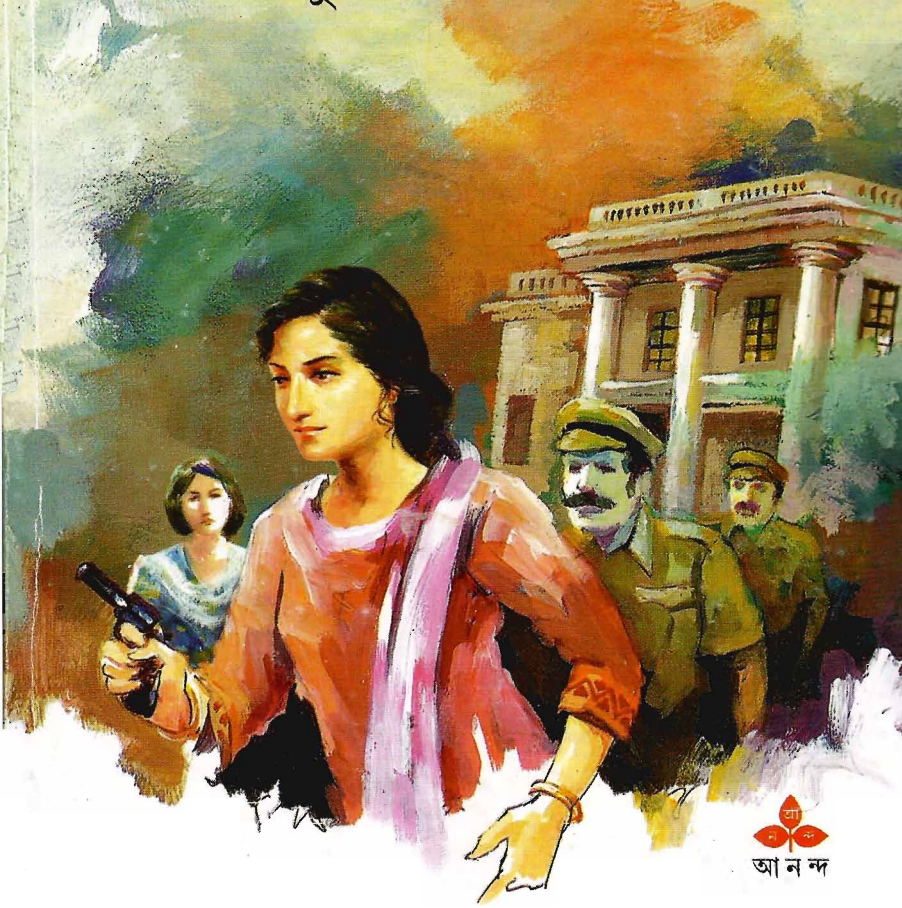

আনন্দ

গুপ্তধনের গুজব

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

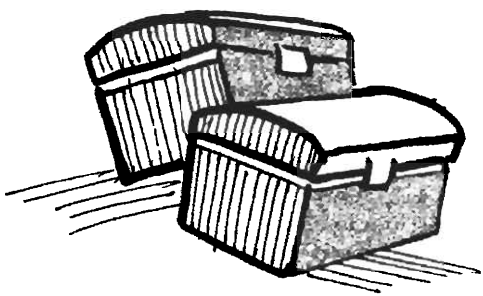

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আনন্দ

ট্রিকু-ছুটকুকে

bengaliboi.com

ভারী ফুরফুরে একটা মেজাজ নিয়ে ঘুম ভাঙল টুপুরের। কাল সন্ধেবেলা সে এসেছে মিতিনমাসির বাড়ি। আজ রবিবার, আগামীকাল জন্মাষ্টমী, পরশু পনেরোই অগস্ট, বুধবার স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস, এখন ক'দিন ছুটিই ছুটি। আর এইরকম মিনি ভেকেশানে মাসির বাড়ি ঘাঁটি গাড়ার মজাই আলাদা। অবিরাম আড্ডা, হইহই, এদিক-সেদিক বেড়ানো, বুমবুমের সঙ্গে খুনসুটি...! কী আনন্দে যে কাটে দিনগুলো। এর সঙ্গে মাসির কোনও কেস চললে তো কথাই নেই। বিপুল উৎসাহে টুপুর ছুটতে পারে তার পিছন-পিছন। উত্তেজনার আগুন পোহানোর সঙ্গে-সঙ্গে মস্তিষ্কে খানিক শান দিয়ে নেওয়াও যায়।

বিছানা ছাড়ার আগে টুপুর ছোট্ট একটা আড়মোড়া ভাঙল। সাড়ে সাতটা বাজে, বুমবুম এখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ভাইয়ের গালে আলতো টোকা দিয়ে পায়ে-পায়ে ঘরের বাইরে এল টুপুর।

লিভিংরুমে উঁকি মারতেই পার্থমেসোর প্রশ্নবাণ উড়ে এল, "অ্যাই মেয়ে, বৃত্রাসুরের আগের জন্মের নাম কী ছিল?... চার অক্ষর।"

টুপুর থতমত মুখে বলল, "কে বৃত্রাসুর?"

"এক অসুর। যাকে মারার জন্য দধীচিমুনির পাঁজরার হাড় দিয়ে ইন্দ্রের বজ্র তৈরি হয়েছিল।"

"ও হ্যাঁ, জানি তো। কী যেন? কী যেন? চিত্রসেন?"

"নো। চিত্রকেতু। এবার চশমার একটা প্রতিশব্দ বল দেখি? তিন অক্ষরের?"

টুপুর প্রমাদ গুনল। পার্থমেসো এখন শব্দজব্দের নেশায় রয়েছে, প্রশ্নে-প্রশ্নে টুপুরকে পাগল করে দেবে। একটা হাই তুলে টুপুর বলল, "জানি না।"

"জেনে রাখ। উপাক্ষ।"

"ও।"

"কতবার বলেছি, ভোরবেলা উঠে শব্দছক করবি, স্মৃতিশক্তি প্রখর হবে। এবার বল তো, জটাসুরের ছেলে...চার অক্ষর...!"

"ঘ্যাঁঘাসুর?"

"তোমার মাথা। অলম্বুষ। ঠিক আছে, এবার একটা সোজা জিজ্ঞেস করছি। আলতার প্রতিশব্দ কী? তিন অক্ষরের?"

"অলক্ত?"

"উঁহু। য দিয়ে।"

টুপুর মাথা চুলকোল, "পারব না।"

"যাবক।" পার্থ দু' দিকে মাথা নাড়ল, "নাঃ, মাসির পোঁ ধরে-ধরে তোর ব্রেনে পলি জমে যাচ্ছে। দাঁড়া, তোকে আরও সোজা একটা...!"

পরবর্তী আক্রমণের অবশ্য সুযোগ পেল না পার্থ। টুপুরকে রক্ষা করতেই বুঝি বেজে উঠল ডোরবেল। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল টুপুর।

অমনি চমক। অনিশ্চয় মজুমদার! পরনে ট্র্যাকসুট, পায়ে স্নিকার, হাতে কায়দার ছড়ি।

পার্থ প্রায় লাফিয়ে উঠল, "স্বয়ং আই জি সাহেব যে! সক্কাল-সক্কাল হঠাৎ গরিবের ডেরায়?"

"ছুটির দিনের ব্রেকফাস্টটা এখানেই সারতে এলাম। আজ আপনাদের মেনু কী?"

"ফুলকো লুচি আর সাদা আলুচচ্চড়ি। উইথ কাঁচালঙ্কা।"

"গ্র্যান্ড!" স্নিকার খুলে অনিশ্চয় সোফায় বসলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "তা গৃহকর্ত্রীকে দেখছি না কেন? তিনি কোথায়?"

"শরীরচর্চা চলছে। ডাকব?"

ডাকাডাকির প্রয়োজন হল না। অনিশ্চয় মজুমদারের বজ্রকণ্ঠ শুনে মিতিন নিজেই বেরিয়ে এল। আই জি সাহেবকে দেখল ঝলক। দোপাট্টায় ঘাম মুছতে-মুছতে বলল, "আপনি কি আজকাল মর্নিংওয়াকেও রিভলবার নিয়ে বেরোচ্ছেন?"

অনিশ্চয় তাড়াতাড়ি কোমরে হাত রাখলেন, "কী কাণ্ড, বোঝা যাচ্ছে নাকি?"

মিতিন মুচকি হাসল, "এটুকুও না নজরে পড়লে গোয়েন্দাগিরি তো ছেড়ে দিতে হয় দাদা। তা এত সতর্কতা কীসের জন্যে? কোনও গুন্ডা-বদমাশ প্রাণহানির হুমকি দিয়েছে নাকি?"

"ওদের আমি থোড়াই পরোয়া করি। তবে আজকাল উগ্রপন্থীদের যা উৎপাত বেড়েছে...! কাকে কখন টার্গেট করে তার ঠিকঠিকানা কী?"

"একদম খাঁটি কথা। সাবধানে থাকাই তো ভাল।" পার্থ সায় দিল, "এত রকম অস্ত্র ওদের হাতে। বোমা, রিভলবার, অটোমেটিক রাইফেল, হাজারও ধরনের বিস্ফোরক, এমনকী, রকেট লঞ্চারও...!"

টুপুর ফস করে বলে উঠল, "কিন্তু ওরা এসব পাচ্ছে কোত্থেকে?"

"দেশের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে চোরাগোপ্তা। আর বাইরে থেকে তো আসছেই।"

"যারা পাঠাচ্ছে তাদের ধরা যাচ্ছে না?"

"চেষ্টার কি কসুর রাখছি রে ভাই। তবে বিদেশ থেকে অস্ত্র

আমদানি ঠেকানো বড় মুশকিল। অন্তত আমাদের এই রাজ্যে। এত লম্বা বর্ডার, স্থলপথ, জলপথ জঙ্গল, পাহাড়... কোন দিক দিয়ে যে কীভাবে এন্ট্রি নেয়! এই তো, মাসখানেক আগে আমাদের গোয়েন্দা দপ্তরে খবর ছিল, সুন্দরবন দিয়ে নাকি বেশ কিছু জিনিস ঢুকছে। তা সে এমন নদীনালার জায়গা, কিছু ট্রেসই করা গেল না।" ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন অনিশ্চয়, "একটাই সান্ত্বনা, শুধু আমরাই যে এঁটে উঠতে পারছি না, তা নয়, আমরা নই, দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ সর্বত্রই এক হাল।"

"হুঁ, গভীর সমস্যা।" পার্থর বিজ্ঞ রায়, "আর্মস আসা রুখতে না পারলে উগ্রপন্থী-দমন খুব কঠিন কাজ।"

কথার মাঝে রান্নাঘরে গিয়েছিল মিতিন। আরতিকে জলখাবারের নির্দেশ দিয়ে সোফায় এসে গুছিয়ে বসল, হাসি-হাসি মুখে অনিশ্চয় মজুমদারকে বলল, "আপনার আগমনের হেতুটা কিন্তু এখনও ভাঙেননি দাদা।"

"বা রে, বললাম যে লুচি খেতে এসেছি।"

"ওটা তো একটা মামুলি উপলক্ষ। আই ওয়াশ। আসল উদ্দেশ্যটা এবার শুনি?"

"ওঃ, আপনাকে নিয়ে পারা যাবে না।" অনিশ্চয় হো হো হাসলেন। পরক্ষণেই সামান্য গম্ভীর, "হ্যাঁ, কারণ একটা আছে বটে। তবে সাংঘাতিক সিরিয়াস কিছু নয়।"

"কীরকম?"

"আপনার কি মনে আছে, হপ্তাতিনেক আগে ডায়মন্ডহারবারের কাছে নুরপুরে একটা ইন্সিডেন্ট ঘটেছিল? মিডিয়ায় বেশ শোরগোলও পড়েছিল ঘটনাটা নিয়ে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। কী এক গুপ্তধন-টুপ্তধন সংক্রান্ত ব্যাপার ছিল। একটা পুরনো বাড়িতে মাটিটাটি খুঁড়তে গিয়ে দু'টো ছেলে ধরা

পড়ে। তারপর থেকে বাড়িটায় রাশি-রাশি লোক গিয়ে ভিড় করছিল...। এখন বোধ হয় কানাডা ফেরত এক ভদ্রলোক থাকেন বাড়িটায়। ভদ্রলোক তো টিভি চ্যানেলে ইন্টারভিউও দিয়েছিলেন। তাঁর মতে গুপ্তধনের অস্তিত্ব নাকি নেহাতই রটনা। লোকজনের ভিড়ে তিনি উদ্বিগ্ন, বিরক্ত। তিনি চাইছিলেন ওইসব হল্লাগুল্লা বন্ধ হোক।"

"আপনার স্মরণশক্তি তো দারুণ!" অনিশ্চয়ের চোখে-মুখে তারিফ। স্মিত মুখে বললেন, "ঘটনাটা তা হলে আর-একটু ডিটেলে আপনাকে জানিয়ে দিই। ওই ছেলে দু'টোকে পুলিশ যথেষ্ট জেরা করেছিল, কিন্তু কিছুই তেমন পাওয়া যায়নি। ওদের বক্তব্য, ওই বাড়ির কুলপুরোহিতের মুখে তারা গুপ্তধনের গল্পটা শুনেছে। আর তাই লোভে পড়ে...!"

"তা কুলপুরোহিতকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেনি?"

"হুঁ, তাও করেছিল। তবে বুড়োটা একেবারেই ফালতু, বড্ড টল টক করে। ও নাকি ওর বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনেছে...। লোকাল পুলিশের মতে সবটাই বুড়োর বানানো গল্প।"

"ছেলে দু'টো এখন কোথায়? নিশ্চয়ই এখনও পুলিশ কাস্টডিতে নেই?"

"ওদের তো পরদিনই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তেমন ক্রাইম তো কিছু করেনি, স্রেফ অন্যের বাড়িতে অনুপ্রবেশ...। তা ছাড়া ভদ্রলোকও কোনও কেসটেস করতে চাননি।"

আরতি চা রেখে গেল। সঙ্গে বিস্কুট। পেয়ালাটা অনিশ্চয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে মিতিন বলল, "তা আমাকে এখন কী করতে হবে? গুপ্তধনের অনুসন্ধান?"

"ঠিক তা নয়। আবার অনেকটা সেরকমও বটে।"

"মানে?"

"ব্যাপারটা তা হলে আপনাকে আর-একটু বিশদে বলি। কানাডা ফেরত ওই ভদ্রলোক, অর্থাৎ বাড়িটির মালিক, আমার খানিকটা পরিচিত। আমার দাদার সহপাঠী ছিলেন। অত্যন্ত পণ্ডিত মানুষ। বিদেশে অধ্যাপনা করতেন, এখানে এসেও লেখাপড়া নিয়েই থাকেন। গত পরশু উনি হঠাৎ আমার কাছে হাজির। একান্তই ব্যক্তিগত কারণে। ওঁর বক্তব্য, গুপ্তধন নিয়ে লোকজনের কৌতূহল কমে গিয়েছে বটে, তবে অন্য এক অশান্তি আরম্ভ হয়েছে। প্রায় রাত্তিরেই নানারকম ভৌতিক কাণ্ডকারখানা নাকি চলছে বাড়িতে। হঠাৎ-হঠাৎ উদ্ভট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যেমন একজোড়া সাহেব-মেমের ঝগড়া, মেয়েলি গলার কান্না, কুকুরের ডাক...।"

"তার মানে বাড়িটায় ভূত আছে?" পার্থর চোখ গোল-গোল, "ভদ্রলোক সেখানে একা-একা বাস করছেন?"

"ভূত নিয়ে ভদ্রলোককে খুব একটা ভাবিত তো দেখাল না। ওঁর ধারণা, ওসব মনের ভুলও হতে পারে। উনি চিন্তিত অন্য একটা কারণে। ক'দিন আগে আবার উনি দু'টো লোককে মাটি খুঁড়তে দেখেছেন। মাঝরাত্তিরে। পাকড়াও করার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু তারা পালিয়ে যায়। এখন ভদ্রলোক ভাবতে শুরু করেছেন, হয়তো কোনও গুপ্তধন থাকলেও থাকতে পারে। উনি তাই ব্যাপারটা প্রাইভেটলি ইনভেস্টিগেট করিয়ে দেখতে চান।"

"বুঝলাম।" মিতিন মাথা দোলাল, "কেসটা তাই আপনি আমায় দিতে চাইছেন?"

"কাজের চাপ বেশি না থাকলে যান না। গুপ্তধন উদ্ধার করাটা তো আপনার ভালই আসে। হয়তো কোনও চিরকুট-ফিরকুট পেয়ে গেলেন। কিংবা জটিল ধাঁধা। সেটাকে সমাধান করে...।" অনিশ্চয়ের মোটা গোঁফের ফাঁকে একফালি হাসি, "ভদ্রলোকের ভালই টাকাকড়ি আছে, আপনার প্রাপ্তিযোগ মন্দ হবে না। তবে

হ্যাঁ, ভদ্রলোক বিষয়টা নিয়ে পাবলিসিটি চাইছেন না একদম। পুলিশ কিংবা মিডিয়ার হাঙ্গামাও তাঁর ঘোরতর অপছন্দ।"

"অর্থাৎ যা করব একেবারে নিঃসাড়ে। তাই তো?"

"কারেক্ট। প্রয়োজনে আমি তো আছিই।"

লুচি-তরকারি এসে গেল। আহারে ভারী মনোযোগী হয়ে পড়লেন অনিশ্চয়। টোকা দিয়ে-দিয়ে ফুটো করছেন ফুলকো লুচি, আলু পুরে সাপটে নিয়ে আস্ত লুচি সোজা চালান করে দিচ্ছেন মুখগহ্বরে। খানপনেরো লুচি উদরস্থ করে মহাতৃপ্তির একটি ঢেকুর তুললেন। থালা শেষ হতে না-হতেই গরমাগরম কফি পৌঁছে গেল হাতে।

বড়সড় কফিমগটায় চুমুক দিয়ে অনিশ্চয় ফের কথায় ফিরলেন, "আপনি তা হলে ভদ্রলোককে কবে মিট করছেন ম্যাডাম?"

"আজই যেতে পারি। দুপুর বিকেলে।"

"গুড। আমি তা হলে ভদ্রলোককে জানিয়ে দিচ্ছি। আপনিও ওঁর নাম আর মোবাইল নাম্বার নোট করে নিন।"

টুপুর অমনি ছুট্টে মিতিনমাসির মোবাইল ফোনটা নিয়ে এল। ভদ্রলোকের পুরো নামটা শুনে তার চক্ষু চড়কগাছ। মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ বাগচী! অস্ফুটে বলেই ফেলল, "এরকম নাম আবার হয় নাকি?"

"ওঁদের পরিবারের সকলের নামই একটু অভিনব। মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ'র বাবার নাম ছিল কপিধ্বজ কপাটবক্ষ বাগচী। তাঁর বাবা, বজ্রধ্বজ বিরাটবক্ষ বাগচী। তাঁর বাবা ছিলেন সিংহধ্বজ সমুদ্রবক্ষ বাগচী।"

"ব্যস, ব্যস, আর এগোবেন না।" পার্থ দু' হাত তুলে থামাল, "রোববারের সকালের পক্ষে ওই সিংহধ্বজ পর্যন্তই যথেষ্ট।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরোতে-বেরোতে দুপুর দু'টো। কাজেকর্মে ঘোরাঘুরির জন্য সম্প্রতি একটা গাড়ি কিনে ফেলেছে মিতিন। লাল টুকটুকে চার-চাকাখানা সাধারণত নিজেই চালায়। আজ সারথির আসনে পার্থ। সবে মাসদেড়েক হল পার্থ ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে, এখনও তার হাত তেমন সড়গড় নয়। আস্তে-আস্তে চালাচ্ছে গাড়ি, অতি সাবধানে। ঠাকুরপুকুরের পর ডায়মন্ডহারবার রোড বেশ সরু, উলটো দিক থেকে বাস-লরি ধেয়ে আসে ক্রমাগত। সাইকেল, অটো, ভ্যানরিকশারও কমতি নেই। সবদিক সামলেসুমলে রীতিমতো কসরত করে এগোতে হচ্ছে পার্থকে। সরিষা-আমতলার মতো ঘিঞ্জি এলাকায় গাড়ির গতি তো প্রায় রুদ্ধ হওয়ার জোগাড়। ডায়মন্ডহারবারের খানিক আগে, ডাইনে বাঁক নিয়ে, টুপুররা যখন নুরপুর পৌঁছল, শেষ শ্রাবণের সূর্য অনেকটাই পশ্চিমে হেলে পড়েছে।

জনপদটি নেহাতই ছোট। একেবারেই গঙ্গার ধারে। সবুজ গাছগাছালিতে ছাওয়া। নদীর পাশ বরাবর উঁচু বাঁধের রাস্তা। একদিকটা চলে গিয়েছে লঞ্চঘাটায়, অন্যদিকে নদী আর বাঁধের মাঝখানে একের পর-এক ইটভাঁটা। গোটাতিনেক ইটভাঁটা পেরোতেই চোখে পড়ল লোহার ফটক। থামের ফলকে এখনও অস্পষ্টভাবে টিকে আছে বাড়ির নাম 'নিন্‌হো'।

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "ভারী অদ্ভুত নাম তো! নিন্‌হো মানে কী?"

পার্থ পথশ্রমে বেজায় ক্লান্ত। তার সংক্ষিপ্ত চালকজীবনে এতখানি লম্বা পাড়ি এই প্রথম। নয়-নয় করেও টানা পঞ্চাশ কিলোমিটার

স্টিয়ারিংয়ে বসে প্রায় ধুঁকছে এখন। তার মধ্যেও ফুট কাটল, "নিন্‌হো মনে হয় ধ্বজাধারীদের কারও ডাকনাম।"

"আজ্ঞে, না স্যার। ওটা একটা পর্তুগিজ শব্দ। মানে 'পাখির বাসা'।" মিতিন গাড়ি থেকে নামল। গেটের উপর চোখ চালিয়ে বলল, "হর্নটা একটু বাজাও তো।"

আওয়াজ দিতেই কাজ হল। প্রাচীন বাড়িখানা থেকে হন্তদন্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন বিশালকায় এক ভদ্রলোক। ছ' ফুটের উপর লম্বা, চওড়া কাঁধ, টকটকে ফরসা রং, মাথাজোড়া টাক, ফোলা-ফোলা গোল মুখে খোঁচা-খোঁচা পাকা দাড়ি, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। দশাসই বপুটি মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ নামের সঙ্গে যেন খাপে-খাপে মিলে যায়।

মিতিন নমস্কার জানিয়ে বলল, "আমি প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। অনিশ্চয় মজুমদার আমায় পাঠিয়েছেন।"

ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বছর পঁয়ষট্টির মীনধ্বজ গেট খুলে দিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেল্টু আমায় ফোন করেছিল। আসুন, গাড়িটা ভিতরে এনে রাখুন।"

পার্থর আর গাড়ি নাড়ানোর ইচ্ছে নেই। বেজার গলায় বলল, "এখানেই থাক না।"

"ভরসা পাচ্ছি না ভাই। যা সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে!"

অগত্যা গাড়ি অন্দরে এল। টুপুর লক্ষ করল, পাঁচিল ঘেঁষে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির নীচে আর-একখানা গাড়ি শোভা পাচ্ছে। বেশ বড়সড়, হালফ্যাশানের। যথেষ্ট দামিও। সম্ভবত মীনধ্বজের।

নুড়ি বিছানো পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে মীনধ্বজের বাড়িখানাও দেখছিল টুপুর। তাকিয়ে থাকার মতোই বাড়ি বটে। পাঁচিলঘেরা বিঘেপাঁচেক জমির মধ্যিখানে খাঁটি বিদেশি স্থাপত্য। বয়স দেড়শো বছর তো হবেই, তবে তেমন জরাজীর্ণ নয়। জমকালো চেহারার

অনেকটাই এখনও অটুট। সবচেয়ে লক্ষণীয়, হঠাৎ দেখে একতলা মনে হলেও বাড়িটি আদতে দোতলা। সাদা পাথর বসানো প্রশস্ত বারান্দা থেকে মোটা-মোটা ডোরিক থাম উঠে গিয়েছে স্যান্ডকাস্টিংয়ের রেলিং দেওয়া ছাদ পর্যন্ত। ওই থামগুলোর আড়ালে দোতলা প্রায় ঢাকা পড়ে থাকে। বারান্দাটাও বেশ উঁচুতে, পাক্কা দশ-দশখানা সিঁড়ি পেরোতে হয়। বারান্দার ওপারে ঘর। কী লম্বা-লম্বা দরজা-জানলা, বাপ্‌স! দরজা-জানলার মাথায় রংবেরঙি শার্সিতে নকশাও রীতিমতো নজরকাড়া।

বারান্দা টপকে টুপুর আরও বিমোহিত। কী প্রকাণ্ড হলঘর রে বাবা! সিলিং একদম টঙে, ছাদের লেভেলে। হলের দু'পাশ দিয়ে জবরদস্ত দু'খানা কাঠের সিঁড়ি, দোতলায় যাওয়ার জন্যে। দোতলার চারদিকে টানা বারান্দা, যেমন পুরনো দিনের হিন্দি ফিল্মে দেখা যায়।

পলকের জন্য টুপুরের মনে হল, এমন ডাকসাইটে বাড়িতে গুপ্তধন থাকতেই পারে।

সুসজ্জিত হলঘরে অজস্র অয়েলপেন্টিং, মাঝখানে পুরু কার্পেটের উপর সোফাসেট। পুরনো হয়েছে সোফাগুলো, তবে ঘরের সঙ্গে মোটেই বেমানান নয়। শ্বেতপাথরের টেবিলও আছে এদিক-ওদিকে, কারুকাজ করা ফুলদানি আর ছোটখাটো ভাস্কর্য দিয়ে সাজানো।

টুপুরদের সোফায় বসিয়ে মীনধ্বজ বললেন, "চা-কফি চলবে তো? নাকি শরবত?"

পার্থ বলল, "আমি আগে একগ্লাস জল খাব।"

শশব্যস্ত পায়ে ভিতরে ছুটলেন মীনধ্বজ। ফিরলেন এক বছর আটাশ-তিরিশের বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে। তার হাতের ট্রেতে তিনগ্লাস জল। একাই সব ক'টা গ্লাস শেষ করে থামল পার্থ।

মহিলাকে কফি বানাতে বলে মীনধ্বজ এবার বসলেন সোফায়। সামান্য গলা নামিয়ে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই ভেল্টুর মুখে সব শুনেছেন?"

মিতিন মাথা নাড়ল, "মোটামুটি। তবে ডিটেলটা তো আপনি বলবেন।"

"কোত্থেকে শুরু করব?" মীনধ্বজকে ঈষৎ উত্তেজিত দেখাল, "সেই প্রথমবার ছেলে দু'টোকে যখন ধরলাম...?"

"আহা, আপনি টেনশন করবেন না। আমি আস্তে-আস্তে সব জেনে নেব।" মিতিন সোফায় হেলান দিল, "আপনি কি এখন এ বাড়িতে একাই থাকেন?"

"হ্যাঁ, একাই তো! মাঝে-মাঝে অবশ্য সন্দীপনও রাতে থেকে যায়।"

"তিনি কে?"

"এ বাড়ির কেয়ারটেকার। ভেরি নাইস চ্যাপ। ও না থাকলে এ বাড়ি থোড়াই এমন বাসযোগ্য থাকত। আমি পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরছি জেনে গোটা বাড়িটাকে ও টিপটপ করে রেখেছিল।"

"আপনারই অ্যাপয়েন্ট করা লোক?"

"না না, তিন পুরুষ ধরে ওরা এ বাড়ির দেখাশোনা করছে। এখন তো প্রায় ফ্যামিলি মেম্বারের মতো হয়ে গিয়েছে।"

"তিনি এখন কোথায়? আছেন বাড়িতে?"

"না। ও তো দুপুরে নিজের বাড়িতে গেল। সন্ধেবেলা আবার আসবে।" বলেই পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করলেন মীনধ্বজ, "ডাকব সন্দীপনকে? কথা বলবেন?"

"থাক, তাড়া নেই। সন্দীপনবাবুর বাড়ি কোথায়?"

"কাছেই। ডায়মন্ডহারবার রোডের মুখটায়। ফোন পেলেই মোটরবাইক নিয়ে চলে আসবে।"

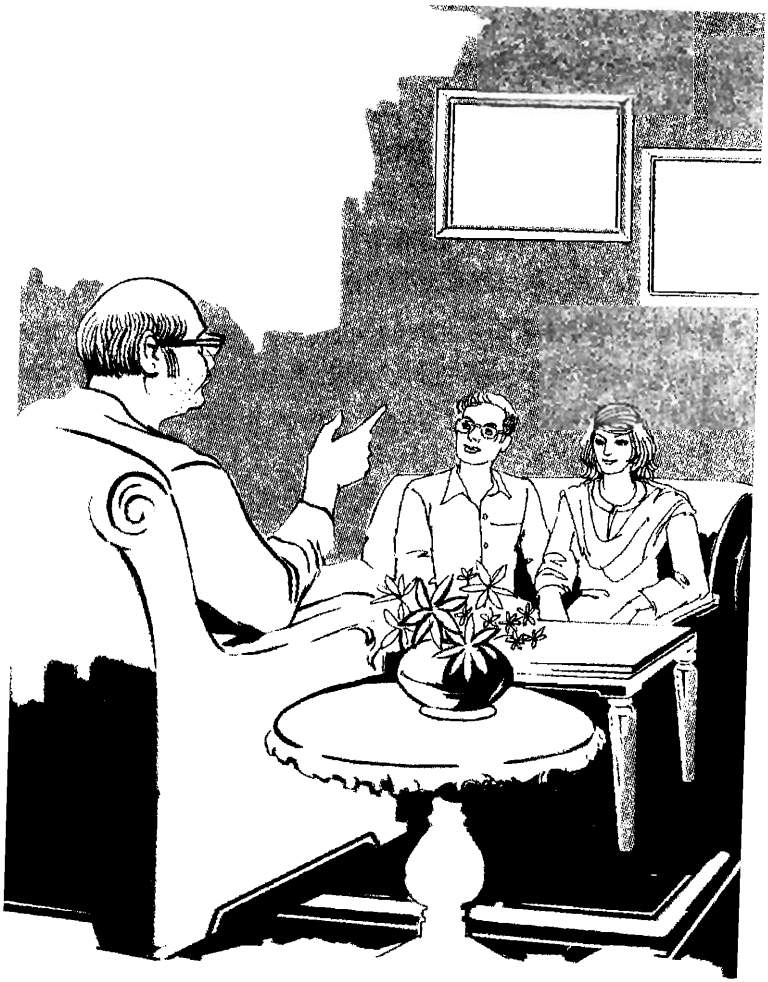

"উনি চব্বিশ ঘণ্টা এখানে থাকেন না কেন?" পার্থ ফস করে প্রশ্ন জুড়ল, "আপনি বয়স্ক মানুষ, যে-কোনও সময় আপনার তাঁকে প্রয়োজন হতে পারে?"

"এতে ওর কোনও দোষ নেই। প্রথম কথা, আমি নিজেকে এজেড ভাবি না। আই অ্যাম ওনলি সিক্সটি সিক্স। অ্যাবসলিউটলি ফিট অ্যান্ড স্ট্রং। সেকেন্ডলি, আমার একটা বাজে অভ্যেস আছে। দীর্ঘদিন বিদেশবাসের কুফল আর কী। বাড়িতে সারাক্ষণ পরিবারের বাইরের কেউ ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলবে, এ আমার মোটেই পছন্দ নয়।" মীনধ্বজ আলতো হাসলেন, "সন্দীপন তো আগে এখানেই থাকত। আমিই ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন তার কাজ রোজ একবার করে দর্শন দেওয়া, আর আমি হাঁক মারলেই তুরন্ত হাজির হওয়া। চটপট আসতে-যেতে যেন অসুবিধে না হয়, তাই মোটরবাইকও কিনে দিয়েছি ছেলেটাকে।"

"ভালই করেছেন।" মিতিন গলা ঝাড়ল, "আপনার কাজের মেয়েটিও নিশ্চয়ই রাতে এখানে থাকে না?"

"প্রশ্নই নেই। করুণা রান্নাবান্না সেরে সন্ধে নাগাদ চলে যায়।"

"তারপর থেকে সারাক্ষণ আপনি একা?"

"হ্যাঁ। যদি না কোনওদিন সন্দীপনকে আটকে রাখি।"

"আপনি আটকান? কেন?"

"আরে, আমি কি একেবারেই অসামাজিক মানুষ?" মীনধ্বজ হো হো হেসে উঠলেন, "এক-আধদিনও কি মানুষের সঙ্গ ভাল লাগতে নেই?"

মিতিনও হেসে ফেলল। আবার কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, করুণাকে দেখে থেমে গেল। কফি আনল করুণা, সঙ্গে তিনটে প্লেটে অমলেট, চানাচুর, সন্দেশ।

খাদ্যবস্তু দেখেই পার্থর চোখ চকচক। টুপুরেরও অল্প-অল্প খিদে পাচ্ছিল। যা খারাপ রাস্তা দিয়ে এসেছে, ঝাঁকুনিতেই দুপুরের ভাত কখন হজম। মেসোর দেখাদেখি হাতে প্লেট তুলে নিল। অমলেট কাটল চামচে।

মীনধ্বজেরও হাতে কফিমগ। মিতিনও চুমুক দিচ্ছে উষ্ণ পানীয়ে। করুণা দৃষ্টির আড়াল হতে মিতিন থমকে যাওয়া প্রশ্নটায় ফিরল, "আচ্ছা মিস্টার বাগচী, প্রথম দিন ঠিক কোন সময়ে দু'টো ছেলে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে ধরা পড়ে?"

"রাত্তিরেই। অ্যারাউন্ড এগারোটা।"

"সেই রাত্তিরে কি সন্দীপনবাবু এখানে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, ছিল বলেই তো সেবার ছেলে দু'টোকে ধরা গেল। রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে আমি দোতলায় নিজের কাজকর্ম নিয়ে বসে ছিলাম। একটা জটিল সমীকরণ মিলছিল না কিছুতেই! ফ্রেশ এয়ার নিতে ছাদে গেলাম। পায়চারি করতে-করতে হঠাৎ চোখে পড়ল, আমাদের ব্যাকইয়ার্ডটায় কারা যেন...। সঙ্গে-সঙ্গে একতলায় নেমে সন্দীপনকে ডাকলাম।"

"উনি তখন কী করছিলেন?"

"টিভি দেখছিল। নিজের ঘরে... আই মিন, ওর জন্য অ্যালট করা ঘরে বসে। আমার মুখে শুনে ও চেঁচামেচি করতে বারণ করল। তারপর দু'জনে পা টিপেটিপে ব্যাকইয়ার্ডে গিয়ে...। ছেলে দু'টো এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে, পালানোর চেষ্টা পর্যন্ত করতে পারেনি। তারপর ওদের আটকে রেখে সন্দীপনই তো পুলিশে ফোনটোন করে...!"

"হুম।" মিতিন কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, "আর লাস্ট যেদিন মাটি খুঁড়তে দেখলেন, সেদিন সন্দীপনবাবু কি...?"

"সন্দীপন থাকলে কি লোক দু'টো পালাতে পারে? আমিও

এমন হাঁকডাক করে ফেললাম...! ওরা হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে সোজা গঙ্গায় নেমে গেল।"

পার্থ তেরচা চোখে বলল, "মাঝেও তো ক'দিন কী সব শব্দটব্দ শুনেছেন?"

"রাতের দিকে মনে হয় কিছু-কিছু আওয়াজ কানে আসে, তবে আমি ঠিক সার্টেন নই। আবার উড়িয়েও দিতে পারছি না। ঘুম ভেঙে একদিন যেন শুনলাম, একজন পুরুষ আর-একজন মহিলা জোর ঝগড়া করছে। ইংরেজিতে। দরজা খুলে বাইরে আসতেই ভোঁ ভাঁ। আর-একদিন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ কানে এল। চুপচাপ শুয়ে থাকতে-থাকতে সুরটা একসময় থেমেও গেল। পরে চিন্তা করে দেখলাম, ওটা বোধ হয় বিড়াল-টিড়ালের ঝগড়া...। গত সপ্তাহে একদিন অবশ্য খুবই ধুপধাপ হচ্ছিল। ঘর থেকে বেরনোর পরও বেশ খানিকক্ষণ শুনেছি শব্দটা।"

"কোন দিক থেকে আসে আওয়াজগুলো?"

"বাড়ির ভিতর থেকেই। যদিও আমি একতলা, দোতলায় হন্যে হয়ে খুঁজেও কোনও সোর্স পাইনি। এক হতে পারে, গঙ্গার ধারে বাড়ি, হয়তো রাত্তিরে উলটোপালটা হাওয়া জানলা-টানলার ফাঁক দিয়ে ঢুকে এখানে-ওখানে ধাক্কা খায়, আর আবোল-তাবোল শব্দ তৈরি করে। কাঠের বাড়িতে তো এরকম হয়ই। আমি বিদেশে দেখেছি।"

"তা হলে আপনি এত আপসেট হচ্ছেন কেন?"

"কারণ, আমার একটা আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, কোথাও একটা গড়বড় আছে। অ্যাদ্দিন কোথাও কিছু ছিল না, হঠাৎ আমি আসার পরেই কোত্থেকে এক গুপ্তধনের গুজব ভেসে উঠল! পাবলিকলি ব্যাপারটা নিয়ে প্রতিবাদ জানানোর পরও রিউমারটা থামল না, তারপরেও লোক আসছে! আর এটাই আমার খুব ফিশি লাগছে।"

মিতিন একটুক্ষণ স্থির চোখে মীনধ্বজকে দেখে নিয়ে বলল, "অর্থাৎ আপনিও এখন গুপ্তধনের রটনাটা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?"

"ঠিক তা-ও নয়। এখনও অবিশ্বাসই করছি। কিন্তু...!" মীনধ্বজের কপালে মোটা ভাঁজ, "বোধ হয় আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না। ইভেন্টগুলোকে যদি কার্যকারণের তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেত!"

"হুম।" মিতিন নড়ে বসল, "তা ঠিক কোন রহস্যটার আপনি সমাধান চান? গুপ্তধন আদৌ আছে কি না যাচাই করতে হবে? নাকি গুপ্তধন খুঁজে বের করতে হবে? নাকি ভৌতিক শব্দগুলোর উৎস জানা গেলেই আপনি সন্তুষ্ট?"

"ধরুন, তিনটেই।" মীনধ্বজকে অস্থির দেখাল। জোরে-জোরে মাথা নাড়ছেন, "জানেন তো, যত ভাবছি, ততই কেমন পাগল-পাগল লাগছে। ব্যাপারটা স্পষ্ট না হলে আমার মানসিক অশান্তিটা কিছুতেই যাবে না। এর একটা বিহিতের জন্যে আমি যে-কোনও অঙ্কের টাকা খরচ করতে রাজি।"

"টাকা জিনিসটা আমার কাছে খুবই মূল্যবান মিস্টার বাগচী। তবে একটা জটিল রহস্যভেদ করার আনন্দ তার চেয়েও দামি।" মিতিনের ঠোঁটে চিলতে হাসি, "আর এই রহস্যটা আমার মোটেই সরল মনে হচ্ছে না।"

"তা হলে কেসটা নিচ্ছেন?"

"অবশ্যই। আমি আজ থেকেই কাজে নামতে চাই। এক্ষুনি।" মিতিন সোজা হল, "চলুন, আগে আপনার গুপ্তধনের স্পটটা দেখে আসা যাক।"

বাড়ির পিছনভাগে চওড়া বারান্দা। সামনের মতোই। সেখান থেকে পাঁচ ধাপ সিঁড়ি নেমেছে। নীচে প্রশস্ত চাতাল। বাঁধানো চাতালের ডান হাতে ঠাকুরঘর। ছোটখাটো একটা মন্দিরও বলা যায়। আবার যেন মন্দির নয়ও। রং গেরুয়া, মাথায় সুন্দর চূড়া, তবু কেমন যেন বিদেশি ছাঁদ। উলটো দিকে খানতিনেক তালাবন্ধ ঘর। সম্ভবত কাজের লোকরা থাকত একসময়। চাতাল শেষে ফের সিঁড়ি, মাটি পর্যন্ত। খানিক গিয়ে গঙ্গায় যাওয়ার বাহারি গেট। ফটকের ওপারে লম্বা রোয়াক বানানো আছে, লোকজনের বসার জন্যে। পশ্চিমে কুলকুল বয়ে চলেছে গঙ্গা, গুমোট শ্রাবণেও আজ ফুরফুরে বাতাস ধেয়ে আসছে নদী থেকে, দিব্যি এক আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছে বিকেল।

গেটের খানিক আগে বাঁয়ে ঘুরলেন মীনধ্বজ। হাঁটতে-হাঁটতে পাঁচিলের প্রায় কোনায় এসে থামলেন। জমির এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এই সেই অকুস্থল।"

একনজরে সেভাবে কিছুই বোঝার উপায় নেই। খোঁড়া জায়গাটা এখন একেবারেই সমতল। একটাই যা তফাত, আশপাশে প্রচুর ঘাস-আগাছার মাঝে ওই ফালি জমিটুকু একদম ন্যাড়া।

মিতিন উবু হয়ে মাটিটা টিপে-টিপে দেখল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এ যে দেখি রীতিমতো পিটিয়ে-পিটিয়ে প্লেন করা হয়েছে!"

"হ্যাঁ, সন্দীপনই লোক লাগিয়ে দুরমুশ করিয়েছে। খোঁড়া মাটি চালান করে দিয়েছে ভিতরে।"

"কেন?"

"যাতে জায়গাটাকে আর আলাদা করে আইডেন্টিফাই না করা যায়।"

"অর্থাৎ, আগে জায়গাটার কিছু বিশেষত্ব ছিল?"

"তা একটু ছিল বইকী। একটা পাথরের স্ল্যাব গাঁথা ছিল ওখানে। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। ওই পাথরের তলায় গুপ্তধন থাকতে পারে, এমন আজগুবি চিন্তা ভুলেও কখনও মাথায় আসেনি। তবে এখন গুপ্তধনের গুজব যদি রটে, আর বাইরের লোক জমিতে আলটপকা একটা পাথর গাঁথা দেখতে পায়, তা হলে তাদের মনে তো সন্দেহ জাগতেই পারে। নয় কি?"

"মানে পাথর-চাপা গুপ্তধন! তা প্রস্তরখণ্ডটি গেলেন কোথায়?"

"চোররা তো ওটা উপড়েই ফেলেছিল। এখন ওই পাঁচিলের ধারে পড়ে আছে।"

"গিয়ে দেখি একটু?"

"শিওর।"

ত্বরিত পায়ে পাথরটার কাছে গেল মিতিন। আয়তাকার খণ্ডটিকে চাগাড় দিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। প্রচণ্ড ভারী, একা পেরে উঠল না, পার্থও হাত লাগাল। কোনওক্রমে খাড়া করার পর দু' পিঠে হাত বুলিয়ে দেখল কী যেন। ফের স্বস্থানে শুইয়ে দিয়ে বলল, "প্রথম কাজ শেষ। এখন আপনার বাড়িটা একটু ঘুরে-ঘুরে দেখি চলুন।"

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে এবার দোতলায় ওঠার পালা। ঘরের কোনও অন্ত নেই। গোটা তিন-চার খোলা, বাকিগুলোয় তালা ঝুলছে। দরজা-জানলাগুলো একই প্যাটার্নের। লম্বা-লম্বা, কাঠ আর কাচের পাল্লা বসানো। মাথায় রঙিন কাচের নকশা। কড়িবরগাওয়ালা উঁচু-উঁচু সিলিংয়ে অদ্ভুত এক প্রাচীন গন্ধ।

মুগ্ধ চোখে দেখতে-দেখতে পার্থ বলল, "আপনার পূর্বপুরুষদের টেস্ট ছিল। খাসা বাড়িখানা বানিয়েছিলেন কিন্তু।"

"ধুস, আমরা বানাতে যাব কেন?" মীনধ্বজ হেসে ফেললেন, "বাড়িটা তো ছিল এক পর্তুগিজ ব্যবসায়ীর। নাম ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডা। ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনও কারণে তাঁর বিবাদ বেধেছিল, তখনই প্রায় জলের দরে আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা শিখিধ্বজ শাল্মলীবক্ষ বাগচীকে বাড়িটা বেচে দিয়ে তিনি দেশে ফিরে যান। এখন থেকে প্রায় সওয়াশো বছর আগে।"

"তখন থেকেই বুঝি আপনারা এখানে?"

"না, না। শিখিধ্বজ তো কখনওই থাকেননি। বাগবাজারে আমাদের সাবেকি বসতবাড়ি ছিল, উনি সেখান থেকে অবরেসবরে এখানে বেড়াতে আসতেন। তাঁর ছেলে সিংহধ্বজ অবশ্য পাকাপাকিভাবে বাস করার কথা চিন্তা করেছিলেন। ভেতরে উঠোনে মিনি চ্যাপেল ছিল, চ্যাপেলটাকে তিনিই মন্দিরে পরিণত করেন। আমাদের কুলদেবতা রাধাগোবিন্দর পূজার্চনাও তখন থেকেই শুরু। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এখানে বসবাসের সাধ তাঁর পূর্ণ হয়নি। তার আগেই তিনি হৃদ্‌রোগে মারা যান। মোটামুটি ঠাকুরদার আমল থেকে আমরা নুরপুরে আছি।"

"আপনি কি এ বাড়ির একাই মালিক এখন?"

"হ্যাঁ। আমার কোনও ভাইবোন নেই।"

"তা পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি...শরিকি ভাগাভাগি...?"

"সেই দায় থেকেও আমি মুক্ত। শিখিধ্বজ উইল করে বাড়িটা সিংহধ্বজকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সিংহধ্বজের ছিল এক ছেলে, দু' মেয়ে। ঠাকুরদার সেই দুই বোন স্বেচ্ছায় এই সম্পত্তির ভাগ ছেড়ে দেন। আবার আমার ঠাকুরদার দু' ছেলে। আমার কাকা পীতধ্বজ পর্বতবক্ষ বাগচী এই বাড়ির অংশের বিনিময়ে বাগবাজারের বাড়িখানা পেয়ে যান। সুতরাং তালেগোলে এ বাড়ির আর কোনও ভাগীদার থাকল না।"

গল্প শুনতে-শুনতে গোটা দোতলাটাই চক্কর মারা হয়ে গেল। শেষে স্টাডিতে এনে টুপুরদের বসালেন মীনধ্বজ। চরম অগোছাল ঘর। দেওয়াল-আলমারি, র‍্যাক, টেবিল, ইজিচেয়ারের হাতল, মেঝে, সর্বত্র শুধু বই আর বই। একটি টেবিলে কোনওক্রমে স্থান পেয়েছে কম্পিউটার, টিভিকে বসানো হয়েছে বেঁটে টুলে।

চটপট চেয়ারে স্তূপীকৃত বইগুলো মেঝেয় নামিয়ে দিলেন মীনধ্বজ। অপ্রস্তুত মুখে বললেন, "এর মধ্যেই কষ্ট করে বসতে হবে কিন্তু!"

মিতিন বসল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলল, "নেক্সট স্টেপটায় এগনোর আগে একটা-দু'টো চিন্তা আমার মাথায় ঘুরছে। কিছু ডেলিকেট প্রশ্ন করছি, আশা করি জবাব দিতে আপনার অসুবিধে নেই?"

"বলুন কী প্রশ্ন?"

"যেমন ধরুন, গুপ্তধন থাকার মতো আপনাদের সঙ্গতি ছিল কি না। সেকেন্ডলি, ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখার কোনও জোরালো কারণ কখনও ঘটেছিল কি?"

পার্থ ফস করে বলল, "শুধু ওঁদের কথাই ধরছ কেন? সেই পর্তুগিজ ব্যবসায়ী ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডা, তাঁরও তো কোনও লুকনো সম্পদ থাকতে পারে?"

"তিনি এই বাড়িতে ধনসম্পত্তি পুঁতে রেখে দেশে চলে গেলেন? ভদ্রলোক কি উন্মাদ ছিলেন?"

"তা অবশ্য ঠিক।" পার্থ মাথা চুলকোল, "যদি কিছু থাকেও, সেটা মীনধ্বজবাবুরই পূর্বপুরুষ...!"

মীনধ্বজ একটু সময় নিয়ে বললেন, "দেখুন ম্যাডাম, আমি চিরকাল পড়াশোনা নিয়েই থেকেছি। তার ওপর বহুকাল বিদেশে। তাই পূর্বপুরুষদের কাহিনি আমার খুব একটা জানা নেই। তবে

যতদূর যা শুনেছি, রাজশাহিতে... মানে এখন যেটা বাংলাদেশে... আমাদের নাকি জমিদারি ছিল। প্রজাদের খাজনার টাকাতেই আমার পূর্বপুরুষরা বসে-বসে খেতেন। গানবাজনার চর্চা করতেন, পায়রা ওড়াতেন, বিড়ালের বিয়ে দিতেন...। ফুর্তির দাপটে সেই জমিদারি একসময় নাকি ক্রোক হয়ে যায়। তবে ততদিনে আমার গুণধর পূর্বপুরুষরা বেশ কয়েকটা বাড়ি তৈরি করে ফেলেছেন উত্তর কলকাতায়। ঠাকুরদাকে... পরে আমার বাবাকেও দেখেছি, ওইসব বাড়ির ভাড়ার টাকাতেই তাঁরা দিব্যি সংসার চালাতেন। অভাব অনটন হয়নি, সচ্ছলই ছিলাম, তবে সাংঘাতিক রইস অবস্থা আমাদের আর ছিল না। এমনকী, আমাকে বিদেশে পাঠানোর জন্যে মাকে গয়না পর্যন্ত বেচতে হয়েছিল। এমন একটি পরিবারে গুপ্তধন থাকার সম্ভাবনা কতটা তা আপনিই বিচার করুন। তবে হ্যাঁ, শিখিধ্বজের সময়ে তো যথেষ্ট রমরমা ছিল, তিনি যদি এখানে কিছু পুঁতেটুতে রেখে থাকেন...!"

"তা কী করে সম্ভব? তিনি তো এখানে থাকতেনই না! ফাঁকা বাড়িতে কি...?"

"হ্যাঁ। সেটাও একটা ভাবার বিষয় বটে।"

মীনধ্বজ চুপ করে গেলেন। পার্থও আর রা কাড়ছে না। মিতিনও ভাবছে কী যেন।

খানিক পরে মিতিন বলল, "এবার একটা-দু'টো ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনি তো দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলেন?"

"হ্যাঁ। প্রায় চল্লিশ বছর।"

"আগাগোড়াই কানাডায়?"

"নাঃ। প্রথমে বছরদশেক বস্টন। বাকি সময়টা ওদেশে। টরন্টোর কাছে ওয়াটারলু বলে একটা ছোট শহর আছে, ওখানেই ইউনিভার্সিটিতে পড়াতাম। অঙ্ক। পিওর ম্যাথমেটিক্স।"

"হঠাৎ চলে এলেন কেন?"

"আমার স্ত্রী বছর আষ্টেক আগে ক্যানসারে মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন আমেরিকান। আমার ছেলেমেয়ে দু'জনেই ওখানে সেটল্‌ড। একজন অটোয়া, অন্যজন ভ্যাংকুভারে থাকে। একা-একা ওয়াটারলুতে মন্দ ছিলাম না, তবে বছর চার-পাঁচ ধরে মনে হচ্ছিল, একাই যদি থাকি, কেন নুরপুরে নয়? মরতে হলে দেশের মাটিতে মৃত্যুই তো ভাল। তাও ফাইনাল ডিসিশান নিতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল।"

"আপনি যে পার্মানেন্টলি চলে আসছেন, তা কি এখানে কাউকে জানিয়েছিলেন?"

"তেমন কেউ তো নেই। বাবা বছর কুড়ি আগে গত হয়েছেন, মা গিয়েছেন সাত বছর। তবে সন্দীপনকে ইন্টিমেট করেছিলাম আসার মাসছয়েক আগে।"

"সন্দীপনবাবু কতদিন এ বাড়ির দেখাশোনা করছেন?"

"বছরতিনেক। তার আগে তো সন্দীপনের বাবাই...!"

"তিনি কি মারা গিয়েছেন?"

"না না, আছেন। তবে বয়স হয়েছে তো, আর পেরে উঠছিলেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করেই উনি সন্দীপনের হাতে বাড়ি ছেড়েছেন।"

"এটা কি সন্দীপনবাবুর হোলটাইম জব?"

"ওর বাবা পর্যন্ত তাই ছিল। তবে সন্দীপনকে আমি ছাড় দিয়েছি। ক' টাকাই বা মাইনে, মাত্র আট হাজার। আজকালকার দিনে তাতে কি চলে? সন্দীপন একটা টিউটোরিয়াল হোম খুলেছে। আরও দু'জন বন্ধু মিলে। দু'টো রোজগারে ওর মোটামুটি কুলিয়ে যায় বলেই মনে হয়।"

"সন্দীপন বিয়ে-থা করেছেন?"

"উঁহু। এখনও ঝাড়া হাত-পা।"

"ও কে। আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট।" মিতিন ঘড়ি দেখল, "এবার কি আমি এ বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"সন্দীপনকে ডাকি তা হলে?"

"তিনি আসুন না ধীরেসুস্থে। তার আগে একবার করুণাকে মিট করি। আপনি বরং ততক্ষণ আমার হাজব্যান্ডের সঙ্গে...!"

"করুণাকে কী জিজ্ঞেস করবেন? ও কী-ই বা জানে?"

"অনেক সময় বিন্দুতেও সিন্ধুদর্শন হয় মিস্টার বাগচী।"

"বেশ, বলুন কথা। শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, ভূতটুতের প্রসঙ্গ তুলবেন না। মেয়েটির হাতের রান্না ভারী চমৎকার। ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে পালালে আমার সমূহ বিপদ।"

কী সরল অনুনয়! টুপুর ফিক করে হেসে ফেলল।

রান্নাঘরটি যথারীতি বড়সড়। ছিমছাম, সাজানো-গোছানো। গ্যাস, চিমনি, ফ্রিজ, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, টোস্টার, মিক্সার-গ্রাইন্ডার...! আধুনিক রন্ধনশালার সমস্ত উপকরণই মজুত। দেওয়ালে কাঠের খোপটোপ বসিয়ে দিব্যি বাহার আনা হয়েছে ঘরখানায়।

মিশকালো গ্রানাইট পাথরের স্ল্যাবের সামনে দাঁড়িয়ে আটা মাখছিল করুণা। হাত চালাতে-চালাতে গান গাইছে গুনগুন। মিতিন-টুপুরের আকস্মিক আবির্ভাবে চমকাল জোর।

কাছে গিয়ে অবলীলায় করুণার কাঁধে হাত রাখল মিতিন, "তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলাম ভাই!"

মিতিনমাসির এই কায়দাটা ভালই কাজ দেয়, দেখেছে টুপুর। ঘনিষ্ঠ ব্যবহারে আপ্লুত হয়ে অনেক সময়ই মনের-প্রাণের কথা বলে ফেলে কাজের লোকজন।

করুণা অবশ্য সহজ হয়নি। অস্ফুটে বলল, "আমার সঙ্গে কী কথা দিদি?"

"বা রে, এক জায়গায় বেড়াতে এলাম... বাড়ির সবার সঙ্গে চেনাজানা করব না? এবার থেকে হয়তো মাঝে-মাঝেই আসব।"

"কেন?"

"এমনিই। জায়গাটা ভারী সুন্দর তো!"

"আমি জানি আপনারা কেন এসেছেন।" শ্যামলা রং ছোট্টখাট্টো চেহারার বউটার ঠোঁটে পলকা হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল, "গুপ্তধনের খোঁজ করতে, তাই না?"

টুপুর অবাক। আড়ি পেতে শুনেছে নাকি?

মিতিন অবশ্য তেমন বিস্মিত নয়। স্বাভাবিক গলাতেই বলল, "মীনধ্বজবাবু বলেছেন বুঝি?"

"না না, সাহেব আমার সঙ্গে ওসব নিয়ে আলোচনা করেন না। আমি আন্দাজেই...!"

"ও।" মিতিন আর ঘাঁটাঘাঁটিতে গেল না। নরমভাবেই বলল, "যাক গে যাক, যা কানে গিয়েছে তা কানেই রাখো। পাঁচকান কোরো না, হ্যাঁ?"

করুণা ঢক করে ঘাড় নাড়ল।

দু'-এক সেকেন্ড নীরব থেকে মিতিন ফের বলল, "তুমি তো জেনেই ফেলেছ কেন এসেছি। এবার তা হলে তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করি?"

"ঠিকঠাক জবাব দিয়ো।" টুপুর ফুট কাটল, "বানিয়ে বললে মাসি কিন্তু ধরে ফেলে।"

"বানিয়ে-বানিয়ে কেন বলব?" করুণা যেন সামান্য ঝেঁঝে উঠল, "আমি কাজ করি, চলে যাই। আগডুম বাগডুম বকে আমার কী লাভ?"

"বটেই তো, বটেই তো।" মিতিন করুণার পিঠে আলতো চাপড় দিল, "তুমি থাকো কোথায় গো?"

"এই তো, বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে বাঁয়ে একটা রাস্তা ঢুকেছে... হেঁটে গেলে মিনিটকুড়ি লাগে।"

"শুধু কি এই বাড়িরই কাজ করো?"

"হ্যাঁ দিদি, গোটা দিনটা তো এখানেই কাটে। সেই সকাল আটটায় ঢুকি, সন্ধের আগে ছুটি মেলে না। ঢাউস বাড়ির দোতলা, একতলা ঝাড়পোঁছ, বাসনমাজা, কাচাকুচি, রান্নাবান্না, সাহেবকে খেতে দেওয়া... কম কাজ?"

"একা হাতে সব করো?"

"সন্দীপনদাদা ঘর পোঁছাপুছির জন্য আলাদা লোক রাখতে চেয়েছিলেন, সাহেব রাজি হননি। বাড়িতে গণ্ডায়-গণ্ডায় লোক ঘুরে বেড়ালে সাহেবের অস্বস্তি হয়।"

"তা হলে মাইনেও নিশ্চয়ই ভালই পাও?"

"তিন হাজার দেন।"

"কবে কাজে লেগেছ?"

"সাহেব আসার পর থেকেই। এই তো... চারমাস চলছে। যখন এলাম, তখন তো সাহেবের অর্ধেক বাক্সপেটরা খোলাই হয়নি। তারপরেও আবার একপ্রস্থ জিনিসপত্র এল। অবিশ্যি সবেতেই শুধু বই আর বই। আমি আর সন্দীপনদাদা যে কতদিন ধরে খালি বই গোছগাছ করেছি!" করুণা ঠোঁট ওলটাল, "অত বই পড়ে মানুষের যে কী হয় কে জানে!"

"বোধ হয় তোমার সাহেবের মতো খ্যাপাটে বনে যায়!"

কথাটা মনে ধরল করুণার, মুখ টিপে-টিপে হাসল। তার হাসির মাঝেই মিতিন আচমকা জিজ্ঞেস করল, "তা এ বাড়ির গুপ্তধনের ব্যাপারে তুমি কী জানো?"

করুণা যেন থতমত, "আমি কী বলব?"

"শোনোনি, দু'টো চোর গুপ্তধন খুঁজতে এসে ধরা পড়েছিল?"

"একথা তো নুরপুরের লোকের মুখে-মুখে ফিরছে দিদি। তারা নাকি গেঁওখালি থেকে এসেছিল, পুলিশ নাকি তাদের খুব পিটিয়েছে...!"

"গেঁওখালি?" টুপুর মিতিনমাসির দিকে তাকাল, "সে তো পূর্ব মেদিনীপুরে। সেখান থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এসে মাটি খুঁড়ছিল?"

"গেঁওখালি কী এমন দূর, বোন? আমাদের ঘাট থেকে ফেরি ধরলে জোর দশ-পনেরো মিনিট। সারাক্ষণই তো এপার-ওপার চলছে।"

"ঠিকই তো।" মিতিন সায় দিল, "তুমি আর কিছু শোনোনি?"

"বললাম যে... সবাই আলোচনা করছে...!"

"আচ্ছা, গুপ্তধনের কথা কি ইদানীং উঠেছে? নাকি আগেও ছিল?"

"গুজব তো একটা ছিলই দিদি। তবে আগে কেউ তেমন মাথা ঘামাত না। গঙ্গার ধারে এমন একটা প্রাসাদ পড়ে থাকলে কত কথাই তো রটে। ছেলে দু'টো ধরা পড়তে এখন মাতামাতি শুরু হয়েছে। ক'দিন যা গেল, বাব্বাঃ! ভিড়ে ভিড়, গেট টপকে এসে সব উঁকিঝুঁকি মারছে... টিভির লোকরাও তো খবর পেয়ে ছুটে এসেছিল। সাহেব তো তখন রেগে কাঁই। ঠাকুরমশাইকে এই মারেন, তো সেই মারেন।"

"ঠাকুরমশাই? মানে এ বাড়ির কুলপুরোহিত?"

"হ্যাঁ গো দিদি। রোজ দু'বার করে আসে, আর খানিক অং বং চং করে চলে যায়।"

"গুজবটা বুঝি উনিই ছড়াচ্ছেন?"

"ওই অপকম্মো আর কে করবে? সারাক্ষণ গাঁজার নেশায় টং, মুখেও অহরহ আজগুবি বুলি। নুরপুরের কেউ ওর কথা ধরে না। ছেলে দু'টো বাইরের ছিল বলেই হয়তো...। আর ওরা দু'টোতে হানা না দিলে থোড়াই লোকে ঠাকুরমশাইয়ের গপ্‌পো নিয়ে মাথা ঘামাত।"

"তা হলে কি গুপ্তধনের খবরটা ভুল?"

"বললাম তো, আজগুবি। মাটির তলে মাটি, তার তলে ঘড়া-ঘড়া মোহর... আহা, কী উপাখ্যানই না ফেঁদেছেন! বাড়ির মালিক খোঁজ রাখেন না, অথচ উনি সব জেনে বসে আছেন, হুঁহ্!"

"তুমি দেখছি ঠাকুরমশাইকে একদমই পছন্দ করো না?"

"ওই খিটখিটে বুড়োটাকে দেখলেই গা জ্বলে। নিজে সারাদিন কোথায় পড়ে থাকে তার ঠিকঠিকানা নেই, আমি ঠাকুরদালানে পা রাখলেই চোটপাট! এঁটো কাপড়ে উঠবি না, চৌকাঠ মাড়াবি না, আমাকে ছুঁবি না...!"

"বুঝলাম, উনি তোমায় খুবই হেনস্থা করেন?" মিতিন ঠোঁট টিপল, "আচ্ছা করুণা, তুমি, সন্দীপনবাবু আর ঠাকুরমশাই ছাড়া আর কার-কার যাতায়াত আছে বাড়িতে?"

"তেমন তো কাউকে দেখি না। কম্পিউটারের একটা লোক আসে মাঝেমধ্যে, উপরে সাহেবের ঘরে বসে কী সব খুটুরখাটুর করে। আর মাসে এক-দু'বার মুনিশ লাগিয়ে সন্দীপনদাদা বাইরের ঝোপঝাড় সাফা করান। এ ছাড়া গ্যাস কিংবা ইলেকট্রিকের লোকটোক...ব্যস।"

"এ বাড়িতে কোনও দরোয়ানও তো দেখলাম না?"

"শুনেছি সন্দীপনদাদারাই এ বাড়িতে থাকতেন। এখন তো আর...!"

"হুম। তা তোমার সাহেব কি সারাক্ষণ বাড়িতেই বন্ধ থাকেন? বেরোনটেরোন না?"

"খুব কম। হপ্তায় হয়তো এক-আধদিন... নিজেই গাড়ি চালিয়ে...। তবে সকাল-দুপুর যখনই যান, সন্ধের মধ্যে ফিরবেনই। লেখাপড়া ছেড়ে নড়তেই যেন আলিস্যি। শুধু পড়তে-পড়তে হাঁপ ধরলে ছাদে খানিক হাঁটেন, নয়তো গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকেন একা-একা।"

"বাঃ, অনেক গল্প করা গেল।" মিতিনের মুখ খুশি-খুশি, "এবার তোমার বিষয়ে কিছু শুনি? বাড়িতে কে কে আছেন?"

"শাশুড়ি, বর, মেয়ে আর ছোট ননদ। মেয়ের সাত পুরে আট চলছে। ইশকুলে পড়ে। ননদের অবশ্য অঘ্রানে বিয়ে।"

"কী করেন তোমার বর?"

"আগে ভ্যানরিকশা চালাত। মালিকের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল, বসিয়ে দিয়েছে। ইদানীং তেমন কিছু করে না। সন্দীপনদাদা বলেছেন, ব্যাঙ্ক লোনে রিকশা কিনিয়ে দেবেন। সেই আশাতেই দিন গুনছে।"

"তোমাদের সন্দীপনদাদা তো খুব ভাল লোক?"

"সে আর বলতে! আমাকে কথা দিয়েছেন, ননদের বিয়ের খরচাও জোগাড় করে দেবেন। দয়ার প্রাণ না হলে আজকাল এমনটা কেউ করে?" বলে একটু থামল করুণা। চোখ পিটপিট করে মিতিনকে দেখল। গলা নামিয়ে বলল, "আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব দিদি?"

"কী?"

"এত যে প্রশ্ন করছেন...আপনি কি মেয়েপুলিশ?"

"কাছাকাছি। মেয়েগোয়েন্দা।"

করুণা কী বুঝল কে জানে, একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "গুপ্তধন আছে কি না জানি না। আমার বর বলে, বড় বাড়ির ব্যাপার, মণিমাণিক্য কোথাও থাকতেও পারে। কিন্তু দিদি, সেটা উদ্ধার কি সোজা কথা? মেয়েরা কি এসব কাজ পারে?"

"অ্যাই, তুমি আমার মাসিকে কী ভাবছ বলো তো?" টুপুর আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। চোখ ঘুরিয়ে বলল, "মাসির এলেম সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে? কত খুনে-ডাকাত-বদমাশ ধরেছে জানো? এই তো, কিছুদিন আগেই...!"

কেউ তার গুণপনার ব্যাখ্যান শুরু করলে চটপট তাকে থামায় মিতিন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন চুপচাপ শুনে যাচ্ছে! নাকি শুনতেই পাচ্ছে না? হঠাৎই করুণা-টুপুরকে হতবাক করে তিরবেগে দরজায় ছুটে গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কাকে যেন কড়া ধমক, "আপনার এই অভ্যেসটাও আছে তা হলে?"

বাইরেটায় এসে টুপুর থ। হাড়ডিগডিগে বেঁটেখাটো চেহারার এক বৃদ্ধ কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। ধবধবে সাদা চুল, কপালে রক্ততিলক, ড্যাবাড্যাবা দু'টো চোখ করমচার মতো লাল। খেঁটো ধুতির প্রান্তখানা খালি গায়ে চাদরের মতো জড়ানো, হলদেটে পৈতে থেকে একথোকা চাবি ঝুলছে।

"ইনিই তবে এ বাড়ির ঠাকুরমশাই?"

মিতিন ফের দাবড়াল, "আড়াল থেকে কী শুনছিলেন, অ্যাঁ?"

"কিছু না তো।" ঠাকুরমশাই ঢোক গিললেন, "করুণার কাছে একটু জল চাইতে এসেছিলাম। কথা চলছে বলে ভিতরে ঢুকিনি।"

"মিথ্যে বলবেন না। চলুন, চলুন আমার সঙ্গে।"

"কোথায়?"

"আপনারই জায়গায়। ঠাকুরদালানে।"

এমন কর্তৃত্বের সুরে হুকুম ছুড়ল মিতিন, সুড়সুড় করে হাঁটা শুরু করলেন বৃদ্ধ। করুণার ভারী আহ্লাদ হল, হাসল মুখে আঁচল চেপে।

পিছনের চাতালে এসে থামল মিতিন। বেজার মুখে বৃদ্ধও। তীক্ষ্ণ চোখে তাঁকে নিরীক্ষণ করে মিতিন বলল, "নেশা করে আছেন মনে হচ্ছে?"

ঠাকুরমশাইয়ের গোমড়া জবাব, "বাবার প্রসাদকে নেশা বলে না।"

"শিবঠাকুরের ভক্ত হয়ে এখানে রাধাগোবিন্দর সেবা করেন?"

"এটা আমাদের বংশের পেশা। আমরা ছিয়াশি বছর ধরে এ বাড়িতে পুজো করছি।"

"অ। আপনারাও তিন পুরুষ? সন্দীপনবাবুদের মতো?"

"না। আমরা চার। আমার ঠাকুরদার বাবা এই মন্দিরের প্রথম পূজারি। দেখে বুঝতে পারবেন না, এই মন্দির আগে ফিরিঙ্গিদের গির্জা ছিল।"

"মন্দিরের কাহিনি শুনেছি। মীনধ্বজবাবু বলেছেন।"

"তা হলে নিশ্চয়ই এও জানেন, আমার ঠাকুরদার বাবা ঈশ্বর ভুজঙ্গমোহন চক্রবর্তী গির্জাটিকে শোধন করে মন্দির বানানোর পরামর্শ দেন। তাঁরই উপদেশমতো যিশু আর মা মেরির মূর্তি বাড়ির নীচে যত্ন করে রাখা আছে?"

"বাড়ির নীচে মানে?"

"তলায়। গর্ভগৃহে।" ঠাকুরমশাইয়ের চোখ তেরচা হল, "কেন, মীনধ্বজ বলেনি বাড়ির নীচে ঘর আছে? অন্তত তিন-চারখানা?"

টুপুর আর মিতিন চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। অমনি তাল বুঝে বৃদ্ধ তরতরিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি ধরছিলেন, মিতিন হাঁ হাঁ করে উঠল, "আরে আরে, চললেন কোথায়? কথা যে শেষ হয়নি?"

"কিন্তু আমার যে আরতির সময় হয়ে গিয়েছে?"

"আহা, একদিন দু'-পাঁচ মিনিট দেরি হলে রাধাগোবিন্দর কিছু ক্ষতি হবে না।"

ঠাকুরমশাই ঘুরে দাঁড়ালেন, "বেশ, বলুন কী জিজ্ঞাস্য?"

মিতিন কেজো গলায় বলল, "আমার পরিচয় তো আপনি জেনে ফেলেছেন। নিশ্চয়ই আগমনের কারণটাও আন্দাজ করতে পারছেন?"

"পারছি।"

"আপনি তো এ বাড়ির সঙ্গে বহুকাল ধরে যুক্ত, হঠাৎ এখন গুপ্তধনের গল্পটা শুরু করলেন কেন বলুন তো?"

"অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী এমনি-এমনি কিছু বলে না।" শ্লেষ্মাজড়ানো প্রবীণ স্বর ঘড়ঘড় বেজে উঠল, "সে যা শোনে, তাই পাঁচজনকে শোনায়।"

"কী শুনেছেন আপনি?"

"আমার বাপ-ঠাকুরদা যা বলতেন। মাটির তলে মাটি, তার তলে ঘড়া-ঘড়া মোহর...!"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান গুপ্তধন সত্যিই আছে?"

"অতশত জানি না। যা শুনেছি, তাই বলি।"

"তা, হঠাৎ মীনধ্বজবাবু ফেরার পরেই কথাটা চাউর করা শুরু করলেন কেন?"

"বাজে অভিযোগ। মোহরের গল্প আমি চিরকালই বলছি। আগে কেউ পাত্তা দিত না, এখন লোকে বিশ্বাস করছে। এতে আমার কী অপরাধ? আমি কি কখনও গুপ্তধন হাতানোর চেষ্টা করেছি?" অপরাধী-অপরাধী ভাব মুছে ফেলে বেশ তেজের সঙ্গে কথা বলছেন অনঙ্গমোহন। ক্ষয়াটে শরীর টানটান করে বললেন, "শুনুন ভাই, পুজোআর্চা করে খাই বটে, আমরা কিন্তু খুব ফ্যালনা পরিবার

নই। আমাদের একটা বংশমর্যাদা আছে। আড়াইশো বছর ধরে নুরপুরে আমাদের বাস। এখানেই আমাদের আদি বাড়ি। এককালে আমাদের বিশাল রমরমা ছিল। আমার পূর্বপুরুষরা হাতি ছাড়া কোথাও নড়তেন না। একবার মন্বন্তরের সময় দশ-দশখানা গ্রামকে আমরা একাই...!"

"বুঝেছি, বুঝেছি। আপনারা অতি উচ্চ ঘর।" দু' হাত তুলে মিতিন থামাল অনঙ্গমোহনকে। ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলল, "কাজের কথায় আসুন তো। ছেলে দু'টোকে আপনি গুপ্তধনের গল্প কবে শুনিয়েছিলেন?"

"কোন ছেলে?"

"যারা মাটি খুঁড়তে গিয়ে ধরা পড়ে।"

"তাদের আমি চিনিই না। ফেরিঘাটের চা-দোকানে গিয়ে অনেক সময় গল্পগাছা করি, তখন ওরা হয়তো শুনেও থাকতে পারে।"

"হুম। আর-একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো? আপনি গুপ্তধনের খবর জানেন, অথচ মীনধ্বজবাবুর এ সম্পর্কে কোনও আইডিয়াই নেই, এটা কী করে সম্ভব?"

"দেখুন, এ বাড়ির মেঝেতে কান পাতলে মোহরের ঝনঝন শোনা যায়। আমার ঠাকুরদা বলতেন, সঙ্গে অনেক দীর্ঘশ্বাসের শব্দও নাকি কানে আসে। শুধু মোহর নয়, বাড়ির নীচে নাকি মানুষের পাপও জমে আছে। মীনধ্বজ যদি কিছুই না শুনতে পায়, সেটা তার দুর্ভাগ্য।"

"আপনি নিজে কখনও শুনেছেন?"

অনঙ্গমোহন জবাব দিলেন না। ঢুলুঢুলু চোখে হাসলেন মিটিমিটি।

হাসিটাকে একটুও পড়তে পারল না টুপুর।

মন্দিরে উঠে গেলেন অনঙ্গমোহন। জোর-জোর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি সারছেন। পিছনের লোহার ফটক পেরিয়ে মিতিন আর টুপুর গঙ্গার ধারে এল।

নদীতে ভাটা চলছে। বাঁধানো পাড়ের অনেকটা নীচ থেকে ঢাল বেয়ে নেমে গিয়েছে থকথকে এঁটেলমাটির কাদা। দেখে আন্দাজ করা যায়, জোয়ারে কতদূর পর্যন্ত জল আসে। ওপারে পশ্চিম আকাশে সূর্য প্রায় ডুবুডুবু, তার লালচে আভায় চিকমিক করছে গঙ্গা। ফেরিঘাট থেকে এই বুঝি একটা লঞ্চ ছাড়ল, ঢেউ কেটে-কেটে যাত্রীবোঝাই জলযান চলেছে গেঁওখালির দিকে। ওপারে স্থলভূমির ছায়া-ছায়া গাছগাছালি যেন জলরঙে আঁকা ছবি।

টুপুর উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "কী দারুণ লাগছে গো মাসি! অপূর্ব!"

মিতিনের দোপাট্টা হাওয়ায় উড়ছিল। গায়ে সাপটে নিয়ে বলল, "স্পটটা কিন্তু ভারী মজাদার। কাছেই দক্ষিণবঙ্গের দু'-দু'খানা বিখ্যাত নদ এসে মিলেছে গঙ্গায়। রূপনারায়ণ, আর দামোদর। রূপনারায়ণের মোহনার এক তীরে গেঁওখালি, অন্য পারে গাদিয়াড়া। আবার নুরপুর যদিও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়, গেঁওখালি পূর্ব মেদিনীপুরে আর গাদিয়াড়া হাওড়ায়। তিনটে জেলারই সীমানায় নদী। মানেটা বুঝতে পারছিস? চাইলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লঞ্চে-লঞ্চে তিনটে জেলা ছুঁয়ে আসতে পারিস।"

টুপুর ভুরু কুঁচকে বলল, "গঙ্গা-রূপনারায়ণের সঙ্গম তো দেখতে পাচ্ছি। দামোদর কোথায়?"

"খানিক ডাইনে। গঙ্গা ক্রস করে গাদিয়াড়া যেতে চোখে পড়ে।"

টুপুর প্রায় বলতে যাচ্ছিল, 'ঝপ করে ঘুরে এলে হয়!' গিলে নিল ইচ্ছেটা। দরকারি কাজে এসে এই ধরনের বায়না জোড়া মানায় না। তা ছাড়া তদন্ত তো আজই চুকছে না! আবার আসতে হবে, তখনই না হয়...!

ভাবনায় ছেদ পড়ল। পিছনে মীনধ্বজের গমগমে গলা, "গঙ্গার শোভা দেখছেন নাকি ম্যাডাম?"

টুপুর, মিতিন একসঙ্গে ঘুরছে। পার্থকে নিয়ে এদিকেই আসছেন মীনধ্বজ। পাশে এক দীর্ঘকায় তরুণ।

ফিসফিস করে টুপুর বলল, "সন্দীপনবাবু নাকি?"

"মনে তো হচ্ছে। বাগচীসাহেবের বোধ হয় তর সইল না। ডেকে নিয়েছেন।"

হ্যাঁ, অনুমান সঠিক। ছেলেটি সন্দীপনই। বেশ ঝকঝকে চেহারা, বয়স বোধ হয় তিরিশও ছোঁয়নি, গায়ের রং ফরসাই বলা যায়, চুল ঈষৎ কোঁকড়া, বাদামি ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখ দু'টো যথেষ্ট উজ্জ্বল। কালো ট্রাউজারস পরে আছে সন্দীপন, গায়ে হালকা নীল বুশশার্ট।

আলাপ করিয়ে দিতেই সন্দীপন স্মিত মুখে বলল, "কাকাবাবু আমার পরামর্শটা শুনেছেন দেখে ভাল লাগল। আমি তো প্রথম থেকেই বলছি, এ বাড়িতে যদি কোনও রহস্য থাকে, সেটি উদ্ঘাটন পুলিশের কম্মো নয়। দরকার একজন পেশাদার গোয়েন্দার। আপনার মতো।"

মিতিন হেসে বলল, "আপনি আমায় চেনেন নাকি?"

"নাম শুনেছি। আপনি তো বিখ্যাত মানুষ। ইলিয়ট রোডের সেই ভুতুড়ে বাড়ির কাণ্ডকারখানা আপনি যেভাবে সল্‌ভ করেছিলেন...। খবরের কাগজে তো ফলাও করে বেরিয়েছিল নিউজটা।"

"কপাল দেখুন, আবার সেই ভূতের বাড়ির সমস্যাই এসেছে।"

"এ বাড়ির কথা বলছেন?"

"অবশ্যই। মিস্টার বাগচী প্রায় রাতেই তো ভৌতিক শব্দ শুনছেন।"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু বলছেন বটে।" সন্দীপন অল্প হাসল, "মজার ব্যাপার কী জানেন তো? আমি রাতে থাকলে কোনও আওয়াজই হয় না! শুধু তাই নয়, আমি তো অন্তত পৌনে তিন বছর এই বাড়িতে একা-একা থেকেছি। কোনওদিনই ওইসব বিদ্‌ঘুটে সাউন্ড কানে আসেনি।"

মীনধ্বজ বললেন, "আমি তো মানছি ওটা হয়তো মনের ভুল।"

"কিন্তু আপনি ভয় তো পাচ্ছেন।"

"মোটেই না। অবাক হচ্ছি।"

"মনের ভুলটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন কাকাবাবু, প্লিজ। না হলে, রাতে নয় আমি এখানে থাকি। যদি একটাও সাউন্ড হয়, সোর্সটা আমি ধরে ফেলবই।"

"ঠিক আছে, সে দেখা যাবেখ'ন।" আলোচনাটা যেন মীনধ্বজের পছন্দ হচ্ছে না, কথা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, "গঙ্গার ধারটা কেমন লাগছে ম্যাডাম?"

"দুর্দান্ত! এখানে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায়।" বলতে-বলতে মিতিনের দৃষ্টি হঠাৎ ঢালের কাদায় স্থির। আঙুল তুলে বলল, "ভাঙা-ভাঙা থামের মতো ওগুলো কী মিস্টার বাগচী?"

"ওখানে এককালে বাঁধানো জেটি ছিল। সেই অল্‌মিডাসাহেবের যুগে। জাহাজটাহাজও নাকি ভিড়ত। আমি অবশ্য জন্ম থেকে জেটির ধ্বংসাবশেষই দেখছি। তবে একটা জিনিস এখনও টিকে আছে।" মীনধ্বজ দু'পা এগোলেন। খাড়া পাড়ের কিনারে গিয়ে সন্তর্পণে ঝুঁকলেন সামান্য। বললেন, "নীচের দিকটা দেখুন। ওই বাঁয়ে।"

দর্শনীয় বস্তুই বটে। টুপুররা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার থেকে খানিক তফাতে, বাঁ দিকে পাড়ের গায়ে এক চৌকো লোহার গেট। মরচে ধরা, কাদামাখা। আকারে রীতিমতো বিশাল। পাড় থেকে শুরু হয়ে খাড়া চলে গিয়েছে ঢাল পর্যন্ত। অন্তত ফুটদশেক চওড়া তো হবেই, উচ্চতাও পনেরো ফুটের কম নয়।

পার্থ গোল-গোল চোখে বলল, "ওটা কী?"

"গেস করুন।"

"স্লুইস গেট?"

"রাইট। সামনে নাকি পরপর আরও তিনটে ছিল। সবই এখন নদীর গর্ভে।"

"এত লকগেট? কেন?"

"এককালে নদী তো এখানে যথেষ্ট তেজিয়ান ছিল, তখন নাকি জলের চাপ কমাতে খুলে দেওয়া হত একটার পর-একটা। শেষ গেটটি ওপেন করলে জল নাকি চলে যেত আমাদের বেসমেন্টে। বোধ হয় ওটা ছিল বাড়িটাকে রক্ষা করার কৌশল। জলের লেয়ার নেমে গেলে বেসমেন্ট আবার ক্লিয়ার হয়ে যেত।"

টুপুর অত্যুৎসাহী মুখে বলে ফেলল, "যেখানে যিশু আর মা মেরির মূর্তি রাখা আছে?"

"না না, ওগুলো তো বেসমেন্টের ঘরে। জল আসত ঘরগুলোর নীচে, চাতালে। সেখানে আউটলেটও ছিল। জলের হাইট বেশি বেড়ে গেলে, আউটলেট দিয়ে নাকি বেরিয়েও যেত।" বলেই মীনধ্বজ থমকালেন, "বেসমেন্টের কথা তোমাদের কে বলল?"

"ঠাকুরমশাই!"

"তার সঙ্গে পরিচয় হল কখন?"

"এই তো, একটু আগে।" মিতিন আবার লকগেটের প্রসঙ্গে ফিরল, "বেসমেন্টে তা হলে জল ঢোকানোর ব্যবস্থা আছে?"

"ছিল। এখন আর নেই। ওই লকগেট বহুকাল ধরেই অচল। খোলা-বন্ধ করার সিস্টেমটাও কোথায় ছিল কে জানে!" মীনধ্বজ গলা ঝাড়লেন, "তখন বললাম না, শিখিধ্বজ কোনওদিনই এখানে বাস করেননি...! তখন থেকেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জাহাজঘাটা, লকগেট, সবই পঞ্চত্ব পেয়েছে। নেহাত আমার ঠাকুরদা নদীর পাড়টা বাঁধিয়েছিলেন, তাই অতীতের স্মৃতিটুকু আছে কোনওরকমে। এ ছাড়া, ভিতরে যাতে জল না ঢোকে, ঠাকুরদা বেসমেন্টে পুরু দেওয়ালও তুলে দেন। সুতরাং লকগেট ব্যবহারেরও আর প্রশ্ন নেই।"

"স্ট্রেঞ্জ! সেই প্রোটেকশান সিস্টেম ছাড়াই বাড়ি অক্ষত আছে?"

"তাই তো দেখছি। জলও অনেক কমে গিয়েছে যে! পদ্মা যত ফুলেফেঁপে উঠেছে, ভাগীরথী তত নিস্তেজ হয়েছে। সেই জন্যই হয়তো আর বিপদটিপদ ঘটেনি।"

"হুঁ।" মিতিন ভাবল কী যেন। বলল, "বেসমেন্টে একবার যাওয়া যায় না?"

"এখন? অন্ধকার হয়ে এল...আমি তো খুব একটা নীচেটিচে যাই না...কারেন্টও নেই! দিনেরবেলা স্কাইলাইটের আলোয় দেখলে বোধ হয় সুবিধে হত।"

সন্দীপন মৃদু স্বরে বলল, "এখনও অসুবিধে নেই। টর্চ তো আছে।"

মীনধ্বজ বললেন, "তুমি তা হলে নিয়ে যাও। আমি আর নামছি না, নীচটা বড্ড স্টাফি।"

বাড়ির সামনে যে দশ ধাপ সিঁড়ি, তার তলাতেই বেসমেন্টের দরজা। তালা খুলে ঢুকল সন্দীপন। টর্চ হাতে চলেছে আগে-আগে। উপরতলার মতো একেবারেই খোলামেলা নয়, বরং সত্যিই খানিকটা

দমচাপা ভাব। তবে আঁধার এখনও তেমন ঘুরঘুট্টি হয়নি। ছোট-ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে আসা অন্তিম সূর্যালোক একটা আবছায়া রচনা করেছে অন্দরে। ছায়াই বেশি, ক্ষীণ আলোটুকু চাপা পড়ে যাচ্ছে টর্চের দাপটে।

টানা লম্বা প্যাসেজের গায়ে পরপর তিনখানা ঘর। প্রথমটায় তো ঢোকারই জো নেই, রাশি রাশি ভাঙাচোরা আসবাবে বোঝাই। একটা পায়াভাঙা চেয়ারের হাতল ছুঁয়ে টুপুর টের পেল, কী পুরু ধুলোর আস্তরণ। দ্বিতীয় ঘরখানায় আদ্যিকালের কিছু লোহালক্কড় পড়ে আছে। তিন নম্বরটিতে চ্যাপেলের মূর্তি আর কিছু আসবাব। ছোট যিশুকে কোলে মাটির মা মেরির পাশেই বড়সড় একটি পিয়ানো। একটা-দু'টো লম্বা বেঞ্চও আছে। ছবি আছে বেশ কিছু। অধিকাংশই ডাঁই করা, দু'-চারটে দেওয়ালে ঝুলছে। মানুষপ্রমাণ ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবিখানা একদিকের দেওয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে। এ ঘরেও প্রাচীন-প্রাচীন গন্ধ।

টর্চের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ঘুরছিল মিতিনের। বলল, "পেন্টিংগুলো তো বেশ ভাল কোয়ালিটির। উপরে নিয়ে গিয়ে টাঙাননি কেন?"

সন্দীপন টর্চটা আবার ঘুরিয়ে বলল, "মন্দিরের যিনি প্রথম পূজারি, তাঁর নাকি বারণ ছিল।"

পার্থ আক্ষেপের সুরে বলল, "এত ভাল একখানা পিয়ানো, তাও কেমন অযত্নে নষ্ট হচ্ছে!"

"উপায় কী বলুন? পূর্বপুরুষদের স্থির করা নীতি তো কাকাবাবু ভঙ্গ করতে পারেন না।"

"তা বটে।" মিতিন জিজ্ঞেস করল, "বেসমেন্টের সেই চাতালটা কোথায়, যেখানে জল আসত?"

"আসুন, দেখাচ্ছি।"

তৃতীয় কামরাটির পিছনে আর-একটি দরজা। খুলতেই ঘোরানো লোহার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। বেশি নয়, দশ-বারো ধাপ। আলো দেখিয়ে-দেখিয়ে মিতিনদের নীচে নিয়ে এল সন্দীপন। খুব একটা বড় নয় চাতালটা। সামনে খাড়া দেওয়াল, পিছনেও খাড়া দেওয়াল। প্রকাণ্ড একটা বাক্সের মতো চেহারা।

সামনের দেওয়ালে আলো ফেলে সন্দীপন বলল, "কাকাবাবুর ঠাকুরদা এই দেওয়ালটাই গেঁথেছিলেন।"

মিতিন একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে বলল, "জল বেরনোর জায়গা ছিল শুনছিলাম?"

"বোধ হয় সাইড ওয়ালে ছিল। নিশ্চয়ই তখনই আটকে দিয়েছেন, এখন তো আর বোঝার কোনও উপায় নেই।"

সবক'টা দেওয়ালেই একটু টোকা মেরে দেখল মিতিন। দেওয়ালে কান পেতে কিছু যেন শোনারও চেষ্টা করল। আপনমনে বলল, "স্ট্রাকচারগুলো সলিড।"

"আগেকার দিনের নির্মাণ ম্যাডাম... তখন তো খুব পাকা কাজই হত।"

"ঠিক। চলুন, এবার ফেরা যাক।"

আবার লোহার সিঁড়ি। তৃতীয় ঘরের মধ্যে দিয়ে ফের প্যাসেজ। বেসমেন্টের বাইরে এসে বড়সড় শ্বাস নিল পার্থ। উদাস স্বরে বলল, "কেন যে এমন গর্ভগৃহ বানানো? শেষ পর্যন্ত তো আবর্জনা জড়ো করার জায়গা!"

"সেটাও এক ধরনের ইউটিলিটি।" মিতিন হাসল সামান্য। সন্দীপনকে জিজ্ঞেস করল, "নীচে কি একদমই আসা হয় না?"

বেসমেন্টের দরজা বন্ধ করছিল সন্দীপন। তালাটা টেনে পরখ করে নিয়ে বলল, "খুব কম। একেবারেই খোলাখুলি না করলে চামচিকে-টামচিকে বাসা বাঁধবে, তাই মাসে এক-আধবার...!"

"চাবি কি আপনার জিম্মাতেই থাকে?"

"কাকাবাবু আসার আগে কাছেই রাখতাম। এখন উপরেই থাকে, দরকারমতো নিয়ে খুলি।"

"আপনারা তো আগে এ বাড়িতেই বাস করতেন?"

"হ্যাঁ, আগে সব্বাই ছিলাম। বছর কুড়ি আগে বাবা ডায়মন্ডহারবার রোডে নিজস্ব বাড়ি বানালেন। তখনই আমি, মা আর দিদি সেখানে চলে যাই। বাবা ওখানেও থাকতেন, এখানেও থাকতেন। আমি অবশ্য এ বাড়ির দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা এখানেই থেকেছি।"

"শুনলাম আপনার একটা টিউটোরিয়ালও আছে? কী পড়ান?"

"কমার্স। এম কম পাশ করেও চাকরিবাকরি জুটল না। তিন বন্ধু মিলে তাই কোচিং ক্লাসটা খুলেছি। বাড়ির কাছেই। তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে।"

"কদ্দিন?"

"বছর দুয়েক।"

"কখন চলে কোচিং?"

"দুপুর থেকে সন্ধে আটটা।"

"আপনার আর দুই বন্ধুও কি নুরপুরের?"

"একজন আমতলার। অন্যজন থাকে ডায়মন্ডহারবারে। কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। চাকরি না পেয়ে আমাদের এমন জেদ চেপে গেল...!"

"কাজের কাজ করেছেন! আচ্ছা সন্দীপনবাবু, অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী মানুষটি কেমন?"

একটু সময় নিয়ে সন্দীপন বলল, "ভালই তো! দোষের মধ্যে দোষ, একটু বানিয়ে-বানিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন। আর একটু নেশাটেশা করেন। তবে লোক খারাপ বলা যাবে না।"

"কিন্তু উনিই তো অশান্তির মূল? গুপ্তধনের গুজবটা তো উনিই ছড়িয়েছেন?"

"ওটা পাকেচক্রে ঘটে গিয়েছে। ঠাকুরমশাইয়ের মুখে গুপ্তধনের গল্প তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনছি। হাসাহাসি করতাম সকলেই।"

"কিন্তু এরকম রটিয়ে উনি কী সুখ পান?"

"কী জানি! আসলে একজন বিফল মানুষ তো, জীবনে কিছুই করে উঠতে পারেননি। পুরুতগিরি করে ক' পয়সাই বা আসে? একটা চাকরি জোগাড় করেছিলেন কোনওরকমে, পিয়নের। কারওর কাছ থেকেই তেমন শ্রদ্ধাসম্মান পাননি কখনও। তিন ছেলের একটাও মানুষ হয়নি। তারা সব এখন উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়ায়। বড়টা তো চিটিংবাজির কেসে একবার হাজতবাসও করে এসেছে। বেচারা ঠাকুরমশাইকে রিটায়ারমেন্টের পর, সংসার প্রতিপালনের জন্য এখন জমি-বাড়ির দালালি করতে হয়। তাই হয়তো দুর্ভাগা লোকটা নিজেকে একটু ওজনদার প্রতিপন্ন করতে ওইসব গল্প এখনও চালিয়ে যান। তা বলে গুপ্তধনের খোঁজে কেউ যে সত্যি-সত্যি শাবল-গাঁইতি নিয়ে হাজির হবে, এতটা বোধ হয় উনিও ভাবেননি।"

"ঠাকুরমশাই কিন্তু আমাদের আর-একটা কথাও বলেছেন আজ।"

"কী?"

"এ বাড়ির নীচে শুধু গুপ্তধন নয়, অনেক পাপও নাকি জমে আছে?"

"পাপ?" সন্দীপন ক্ষণিক নিশ্চুপ। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "এটা তো নতুন শুনছি! কিন্তু এ বাড়িতে পাপ জমা হবে কোত্থেকে? আমি যতটুকু জানি, কাকাবাবুর পূর্বপুরুষরা কেউই তো তেমন

খারাপ লোক ছিলেন না! হয়তো সেভাবে কেউ রোজগারপাতি করেননি। বংশের পয়সায় বসে-বসে খেয়েছেন। উত্তর কলকাতায় তো অনেক বাড়ি ছিল, একে-একে প্রায় সবই গিয়েছে। সেও তো ওই আলস্যের কারণে। কিন্তু কারও উপর ওঁরা অত্যাচার করেছেন, কিংবা কাউকে ঠকিয়ে তার সম্পত্তি গ্রাস করেছেন, এমন অভিযোগ কস্মিনকালেও শুনিনি। ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন, কী পাপ? কে করেছে?"

"হুঁ, প্রশ্নটা করা হয়নি। আচ্ছা, অনঙ্গবাবুরা কি এ বাড়িতে থাকতেন কখনও?"

"ভুজঙ্গমোহন নাকি অল্প কিছুদিন ছিলেন। তারপর কাকাবাবুর ঠাকুরদার বাবা তাঁকে খানিকটা জমি কিনে দেন, সেখানেই বাড়িঘর বানিয়ে...!"

টুপুর বলল, "সে কী? ঠাকুরমশাই যে বললেন এখানে আড়াইশো বছর ধরে আছেন? ওঁদের নাকি বিশাল অবস্থা ছিল...?"

"তুমি বুঝি বিশ্বাস করেছ?" সন্দীপন হেসে ফেলল, "ওটা নিয়েও তো ঠাকুরমশাইয়ের গল্প আছে। গঙ্গা নাকি ওঁদের প্রাসাদের মতো অট্টালিকাটি গ্রাস করে নিয়েছে...!"

"রং চড়ানোটা বোধ হয় ওঁর নেশা।" মিতিন না হেসেই বলল, "আর-একটা কথাও আমার জানতে খুব ইচ্ছে করছে সন্দীপনবাবু। গুপ্তধনের গল্প তো আপনার শৈশব থেকেই শোনা। তারপর বেশ কিছুদিন এ বাড়িতে একাই ছিলেন। তখনও কি কখনও রটনাটা সত্যি কি না যাচাই করার কৌতূহল আপনার জাগেনি?"

"ওই খুঁড়েটুড়ে দেখা?" সন্দীপন এবার বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। পরক্ষণেই মুখখানা গ্রাম্ভারি করে বলল, "দেখুন ম্যাডাম, আমার বাবা একটা কথা প্রায়ই বলেন। আমরা নাকি গুপ্তধনের চেয়েও অনেক বেশি কিছু পেয়ে গিয়েছি। কাকাবাবুর বাবা প্রায়

রাস্তা থেকে তুলে এনে আমার ঠাকুরদাকে এ বাড়িতে ঠাঁই দেন। তারপর আর কোনও দিন আমাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা করতে হয়নি। দিদির বিয়ে, আমার পড়াশোনা...এমনকী, বাবা যে বাড়িটা বানিয়েছেন, তার পিছনেও কি কাকাবাবুদের অর্থসাহায্য কম ছিল? এ বাড়িতে মাটির উপরেই যখন এত পেয়ে গিয়েছি, মাটির তলায় আর কেন ঘড়া-ঘড়া মোহর খুঁজতে যাব বলুন?"

প্রশ্নোত্তরের মাঝেই মীনধ্বজ বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। উদ্‌গ্রীব মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ম্যাডাম, পরিদর্শন কমপ্লিট?"

মিতিন হাসল, "হল এক রাউন্ড।"

"কিছু হদিশ পেলেন?"

"এত তাড়াতাড়ি?" মিতিনের হাসি চওড়া হল, "আমি কি ম্যাজিক জানি?"

এবার আর পার্থ নয়, স্টিয়ারিংয়ে মিতিন। যাওয়ার সময় গাড়ি চালিয়ে যা পরিশ্রম হয়েছিল, ফেরার পথে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে তার ডবল উশুল করে নিল পার্থ। গোটা রাস্তা মিতিনও স্পিকটি নট। কোনও তদন্ত শুরু করলে এটাই মিতিনের দস্তুর। টুপুরেরও মুখে কুলুপ। এখনও তার চোখে ভাসছে অপরূপ এক নদী, এক নয়নাভিরাম সূর্যাস্ত, নদীতে ছড়িয়েছিটিয়ে ভেসে থাকা নৌকো, ওপারের ছায়া-ছায়া গাছপালা, বাড়িঘর...। গঙ্গা রূপনারায়ণের সঙ্গমটাও দেখা হল। দামোদরটাই যা বাকি রয়ে গেল, ইস!

বাড়িতে ঢুকেই অবশ্য নীরবতার ইতি। বুমবুম কেন এখনও

খাওয়া না সেরে কম্পিউটারে, তাই নিয়ে বকাবকি জুড়ল মিতিন। টুপুর টুক করে টিভিতে একটা রিয়েলিটি শো দেখতে বসে গেল। ঢাউস এক কাপ চা খেয়ে পার্থও দিব্যি টগবগে। মিতিনের উদ্দেশে টিপ্পনী ভাসিয়ে দিল, "তোমার ভেল্টুদাদা তোমাকে কিন্তু একটা ফালতু কেসে ফাঁসিয়ে দিলেন।"

আরতি টেবিলে খাবারদাবার রেখে চলে যাচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করে এসে বুমবুমকে আহারে বসাল মিতিন। আলগোছে পার্থকে বলল, "কেন, কেসটার কি মেরিট নেই?"

"একেবারেই না।" পার্থ চেয়ার টেনে গুছিয়ে বসল। হাতের ইশারায় ডাকল টুপুরকে। টেবিলে আরও তিনখানা প্লেট সাজিয়ে টুপুরকেই সাক্ষী মানল, "তুইই বল, তোর মাসি এমন একটা জিনিস খুঁজতে গিয়েছে, যেটা আছে কি না সে সম্পর্কেই কেউ নিশ্চিত নয়। কস্মিনকালে তার অস্তিত্ব ছিল কি না তাও কেউ জানে না। শুধুমাত্র এক গুলবাজ বুড়ো ছাড়া।"

প্রিয় অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠতে হয়েছে বলে টুপুর যেন খানিক আনমনা। ঢক করে ঘাড় নেড়ে বলল, "তা অবশ্য ঠিক।"

ক্যাসারোল খুলে প্লেটে রুটি নিল পার্থ। টুপুরকেও দিল। হাতায় মাটনকারি তুলতে-তুলতে বলল, "তারপর ধর, এমন একটা ক্রাইম হয়েছে, যা অপরাধ পদবাচ্যই নয়। দু'টো বুদ্ধু খামোখা মাটি খুঁড়ে পুলিশের রুলের গুঁতো খেয়েছে। ঠিক, কি না?"

টুপুর স্যালাড টানল, "সেরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে!"

বেজায় উৎসাহ পেল পার্থ। মুখে আরও বিজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে বলল, "তারপর দ্যাখ, বাড়িতে এমনই ভৌতিক ঘটনা ঘটছে, যাতে কেউই তেমন ভীত নয়।"

"হুঁ।" টুপুর রুটি ছিঁড়ল, "মীনধ্বজবাবুকে তো মোটেই আতঙ্কিত দেখাল না।"

"ওই মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ বাগচী একটি ট্যাবলেট, বুঝলি? যখনই দেখেছি গেটে দরোয়ান নেই, তখনই বুঝেছি, ইনি একটি হাড়কেপ্পন। এত দূর গেলাম, অতক্ষণ রইলাম...স্টমাকে কী জুটল বল? নাম মীনধ্বজ, অথচ ক'টা ফিশফ্রাইও খাওয়াতে পারলেন না!"

টুপুর হেসে বলল, "বুঝেছি, তুমি খুব ক্ষুধার্ত। তাড়াতাড়ি হাত চালাও।"

"উঁহু, খিদেটা বড় কথা নয়। এটা আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। অমন লম্বাচওড়া একটি নাম বয়ে বেড়াচ্ছেন, থাকেন পেল্লাই এক প্রাসাদে...শোনালেন রাজশাহির জমিদার ছিলেন। অথচ বুকের খাঁচাটা এইটুকু।" আঙুলের মুদ্রায় মীনধ্বজের হৃদয়ের মাপখানা দেখাল পার্থ। রুটির টুকরো ঝোলে ডুবিয়ে বলল, "খুব তো তোর মাসিকে বারফট্টাই দেখালেন, এনি অ্যামাউন্ট দিতে পারেন! কিন্তু একটা পয়সাও তো অ্যাডভান্স ঠেকালেন না!"

"আহা, মাসিও তো বলল, আজ কিছু লাগবে না!"

"অমনি উনি হাত গুটিয়ে নেবেন? এ কী ধরনের ভদ্রতা?" পার্থ আবার মিতিনকে খোঁচাল, "তোর মাসিটাও হয়েছে সেরকম! যা আসছে, ঝটাক্‌সে ব্যাগে পুরে ফ্যালো...! তা নয়, উনি ভবিষ্যতের আশায় তাকিয়ে আছেন! আরে বাবা, পরে তো লবডঙ্কা জুটবে!"

"কেন?"

"কারণ, কেসটায় কিস্‌সু নেই। নো রহস্য, নো ক্রাইম, না কোনও অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। সারমর্ম বুঝে গেলে মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ তোর মাসিকে টা টা করে দেবে। এবং তোর মাসির ভেল্টুদা আড়ালে তখন খ্যাকখ্যাক হাসবে।"

পর্বতাকৃতি অনিশ্চয় মজুমদারের 'ভেল্টু' নামটা শুনলেই টুপুরের পেট গুলিয়ে হাসি আসছে। এখনও কোনওক্রমে হাসিটা চেপে জুলজুল চোখে মিতিনমাসিকে দেখল টুপুর। আশ্চর্য, কোনও

প্রতিক্রিয়াই নেই? এত শ্লেষ-বিদ্রুপের পরেও? একমনে রুটি-মাংস খাচ্ছে আর মাঝেমধ্যে বাঁ হাতের চাপড়ে তাড়া লাগাচ্ছে বুমবুমকে!

অগত্যা টুপুরকেই হাল ধরতে হয়। ভুরুতে একটা ভাঁজ এনে টুপুর বলল, "আমার কিন্তু ব্যাপারটা একদম সিধেসাদা লাগছে না মেসো। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছি।"

"ওটা তোর ঘ্রাণশক্তির দোষ। মাসির সঙ্গে থেকে-থেকে হয়েছে।"

"উঁহু। ঠাকুরমশাই মানুষটি ধরো পঞ্চাশ বছর ধরেই এক গল্প করছেন। কিন্তু মীনধ্বজবাবু পাকাপাকিভাবে ফিরে আসার পরই গুপ্তধনের সন্ধানে কেউ হানা দিল। এটা কি খুব স্বাভাবিক?"

"স্রেফ কাকতালীয়।"

"আর অনঙ্গমোহনবাবুর আড়িপাতাটা?"

"ওটা অনেকের নেচার থাকে। কেউ কথা বললে লুকিয়ে-লুকিয়ে শোনার।"

"অনঙ্গমোহনবাবু সম্পর্কে আর-একটু কিন্তু ভাবার আছে। করুণা একদমই অনঙ্গমোহনকে পছন্দ করে না। মীনধ্বজবাবুও বাড়ির ঠাকুরমশাইটির উপর প্রীত নন। লক্ষ করছিলে, মাসি যেই অনঙ্গমোহনবাবুর কথা তুলল, অমনি মীনধ্বজবাবুর চোয়াল পলকের জন্য হলেও কেমন কঠিন হয়ে গেল?"

"আমি অত খেয়াল করিনি।" বলেই পার্থ পালটা তর্ক জুড়ল, "অবশ্য অনঙ্গমোহনের মতো একটি চিড়িয়াকে পছন্দ করারও তো কোনও কারণ দেখি না। এক সন্দীপন ছাড়া সকলেই ওঁর নিন্দামন্দই করবে।"

"তাই?"

"ইয়েস। সন্দীপন ছেলেটার মনটা ভাল বলে, যথাসম্ভব রেখেঢেকে কমেন্ট করছিল।"

"আমি শুধু অনঙ্গমোহনবাবুর কথাই বলছি না।" টুপুর তাড়াতাড়ি বলল, "করুণাই বা জানল কী করে, মাসি ডিটেকটিভ? সেও নিশ্চয়ই আড়ি পাতে। তারপর...আমরা যেটা প্রায় ধরছিই না...দ্বিতীয় আর-একদিন চোর এসেছিল। কী উদ্দেশ্যে?"

"সেম ধান্দা। কাল্পনিক গুপ্তধন।"

"কিন্তু তারা তো খোঁড়াখুঁড়ি করেনি? জায়গাটা তো প্রথম ঘটনার পরেই মাটি ফেলে দুরমুশ করে দেওয়া হয়েছে! এবং এখনও ইনট্যাক্টই আছে জায়গাটা!"

"দ্বিতীয়বার গাঁইতি মারার সুযোগই তো পায়নি। মীনধ্বজবাবু এমন হল্লা জুড়েছিলেন...!"

"আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, গুপ্তধনের জন্য প্রথমবার খোঁড়াখুঁড়ির পর করুণা তো স্পটটা জেনেই গেল! তারপর হয়তো সেকেন্ড টাইম ও কাউকে পাঠিয়েছিল? হয়তো ওর বর, সঙ্গে আর কেউ...? পাছে তার ওই ষড়যন্ত্র মিতিনমাসি ধরে ফেলে, কথা বলার সময় তাই অত আড়ষ্ট ছিল?"

"ওটা অবশ্য তুই জানিস। করুণাকে জেরার সময় আমি তো ছিলাম না। তবে, করুণার বর যদি খুঁড়তে এসেও থাকে, তা হলেও কি গুপ্তধন আছে প্রমাণ হয়?"

"যাই বলো, মীনধ্বজবাবুরই কিন্তু জায়গাটা খুঁড়ে দেখা উচিত এখন।"

"উচিত তো বটেই। আমি হলে তো ডিটেকটিভ না ডেকে নিজে আগে দেখতাম।"

"সন্দীপনই বা দেখল না কেন?"

"এটাই তো প্রমাণ করে, গুপ্তধনের ব্যাপারটাই ফক্কিকারি। নইলে সন্দীপন যতই ডায়ালগ ঝাড়ুক, ট্রাই একটা নিতই। মীনধ্বজবাবুরা উপকার করেছেন বলে কি সন্দীপনের লোভলালসা সব উবে

গিয়েছে? মুখে বললেই মানতে হবে? মীনধ্বজবাবুরই তো গুপ্তধন থাকতে পারে এই আশায় চোখ চকচক করছিল!"

"আমার আর-একটা কথাও মনে হচ্ছে, বুঝলে মেসো। গুপ্তধনের গুজবটার সূত্র ধরে, একটা হাঙ্গাম-হুজ্জোত বাধিয়ে এবং তার সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপারট্যাপার জড়িয়ে কেউ হয়তো মীনধ্বজবাবুর উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে!"

"কেন?"

"মীনধ্বজবাবুকে উৎখাত করার জন্যে।"

বুমবুমের খাওয়া শেষ। চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমেও দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘুরে বলল, "উৎখাত মানে কী?"

"উৎখাত হল গিয়ে...।" পার্থ নাক কুঁচকে বলল, "ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাউকে স্থানান্তরীকরণ।"

বুমবুম চোখ পিটপিট করল, "বাংলায় বলো না।"

"বেশ, সরলভাবে বোঝাচ্ছি। ধর, তুই কম্পিউটারে গেম খেলছিস। তোর টুপুরদিদি গিয়ে তোকে ঘেঁটি ধরে তুলে দিল...এটাকেই বলে উৎখাত। ক্লিয়ার?"

বুমবুম মাথা দোলাতে-দোলাতে চলে গেল বেসিনের দিকে।

পার্থ আবার প্রসঙ্গে ফিরল। টুপুরকে বলল, "উৎখাত কেন করবে শুনি?"

"বাড়িটার দখল পাওয়ার জন্যে। কিংবা উনি যাতে বিরক্ত হয়ে বাড়িটা বেচে দিয়ে চলে যান? অনঙ্গমোহন তো জমিবাড়ির দালালি করেন, তাঁরই ইন্টারেস্ট থাকতে পারে। হয়তো কেনার লোক আছে, বিক্রি হলে অনঙ্গমোহন মোটা কমিশন পাবেন।"

পার্থ চোখ বুজে ভাবল একটুক্ষণ। তারপর দু'দিকে ঘাড় নাড়ল, "না রে, গুপ্তধনের গপ্পো রটিয়ে কাউকে বাড়ি থেকে ভাগানো যায় না। একমাত্র ভূতের ভয়টাই...! তবে সেটাও তো তেমন কাজের

নয়। আই মিন, ওতে মীনধ্বজবাবু চট করে ঘায়েল হবেন না। প্লাস, অঙ্কের টিচার তো, তেমন জুতসই ভুতুড়ে ছাত্র পেলে অঙ্ক কষানো আরম্ভ করবেন।"

টুপুরের খেই হারিয়ে গেল, "আর তো কোনও পয়েন্ট মাথায় আসছে না মেসো। করুণা, অনঙ্গমোহন, সন্দীপন, যাকেই সন্দেহ করি না কেন, একটা লাগসই মোটিভ তো চাই।"

"পাবি না।" পার্থ খিকখিক হাসল, "বললাম তো, কেসটা পুরো ফাঁপা। তোর মাসিকে লাট খাইয়ে ভেল্টুবাবু এবার ড্যাং-ড্যাং কাঁসর বাজাবেন।"

মিতিন একভাবে খেয়ে যাচ্ছে। একটিবার ঘাড় তোলারও নাম নেই। টুপুর করুণ মুখে বলল, "ও মাসি, কিছু একটা বলো না!"

বহুক্ষণ পর মিতিনের স্বর ভেসে উঠল, "দাঁড়া, আগে তোর মেসোর বোলচাল খতম হোক।"

"বেশ, আমি চুপ করলাম।" পার্থ যেন উসকাল, "এবার তুমি চালু হও।"

"নাঃ, তেমন বলার কিছু নেই। আমি শুধু দু'-একটা ব্যাপার ভাবছি।"

"কীরকম?"

"খুঁড়ে মাটি মেলে, বোজাতেও মাটি লাগে।"

"মানে?"

মিতিন মুখ তুলল এবার। চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল, "পাপ কাকে বলে?"

"অন্যায় কাজকে। অমানবিক কাজকে।"

"রাইট। এখন বলো, উচ্চতা কি মিলছে? কিংবা দৈর্ঘ্য?"

"কীসের?"

"ক্রমশ প্রকাশ্য।" মিতিন গলাখাঁকারি দিল, "কাল আমাদের দ্বিতীয় অভিযান। প্রস্তুত হও টুপুর!"

সকাল ন'টার মধ্যে মিতিন স্নানটান সেরে তৈরি। মাসির তাড়া খেয়ে টুপুরও। পার্থ আজ অভিযানে অংশ নিতে পারছে না। প্রেসে বিস্তর কাজ আছে, কাকে-কাকে যেন জিনিস ডেলিভারি দিতে হবে। মুখে যতই টিপ্পনী কাটুক, আজও তার নুরপুর যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। বাসনায় জল পড়ে যেতে সে যেন ঈষৎ ক্ষুব্ধ।

শেষ মুহূর্তেও পার্থ একবার বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করল, "কাল পনেরোই অগস্ট, কালই চলো না। ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়ব। বুমবুমকেও নেব সঙ্গে। চমৎকার একটা আউটিং হয়ে যাবে।"

প্রস্তাবটা আমলই দিল না মিতিন। সরাসরি বলল, "আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না স্যার। তা ছাড়া, এখন একটা দিনও আমি নষ্ট করতে রাজি নই।"

"দিন তো তোমার এমনিতেই নষ্ট। বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে বেড়ানোই তো অর্থহীন।" মিতিনকে নিরস্ত করতে না পেরে পার্থর পুটুস হুল। পরক্ষণেই স্বরে উপদেশ, "যাক গে, সাবধানে যেয়ো। গাড়িতে তেল বেশি নেই, ট্যাঙ্কি ভরে নিতে ভুলো না যেন!"

"আমরা তো গাড়ি নিচ্ছি না।"

"বাসে যাচ্ছ নাকি? ঝাঁকুনিতে কোমর খুলে যাবে কিন্তু।"

"তোমাকে টেনশান করতে হবে না। পারলে তাড়াতাড়ি ফিরে বুমবুমকে কোথাও একটা ঘুরিয়ে এনো।" বলেই টুপুরকে নিয়ে মিতিন রাস্তায়। মোড়ে এসে ট্যাক্সি ধরল। সিটে বসে নির্দেশ, "হাওড়া।"

টুপুর অবাক, "ও মা! হাওড়া যাব কেন?"

"আজ রুটটা একটু বদলাচ্ছি। হাওড়ায় ট্রেন ধরে বাগনান, সেখান থেকে গাদিয়াড়া। তারপর জলপথ।"

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল! কাল মনে-মনে গাদিয়াড়ার কথা ভাবছিল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই আশা পূরণ হতে চলেছে! টুপুর আহ্লাদিত মুখে বলল, "হঠাৎ এই প্ল্যান?"

"দেখতে চাই, অন্যভাবে নুরপুর পৌঁছতে কেমন লাগে।"

অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে মিতিনমাসির, তবে ভাঙতে না চাইলে টুপুরই বা জোরাজুরি করবে কেন? একসময় তো জানা যাবেই, এখন চুপচাপ মিতিনমাসিকে দেখে যাওয়াই ভাল।

বাগনান পৌঁছে একটা অটো নিয়ে নিল মিতিন। হাওড়ার এদিকটায় টুপুর আগে কখনও আসেনি। চারদিক এমনিতেই সবুজ, বর্ষায় ভিজে সেই সবুজ যেন ঝকঝক করছে। পড়ছে ছোট-ছোট গ্রাম, একটু ভিড়-ভিড় জনপদ! এক জায়গায় মেলাও চলছে জন্মাষ্টমীর। রঙিন পোশাকে অনেক কচিকাঁচা জড়ো হয়েছে সেখানে। শেষে বেশ খানিকটা ভাঙাচোরা রাস্তা পেরিয়ে টুপুররা যখন গাদিয়াড়া পৌঁছল, ঘড়ির কাঁটা তখন বারোটা ছুঁইছুঁই।

অটোর ভাড়া মিটিয়েই মিতিন নদীর পাড়ে ছুটল। সামনেই বয়ে যাচ্ছে রূপনারায়ণ। গঙ্গাও বেশি দূর নয়। কাল গঙ্গায় তেমন জল ছিল না, তুলনায় রূপনারায়ণ আজ থইথই। উঁচু পাড় ঢাল হয়ে নেমেছে নদীতে, জলে বাঁধা আছে সার সার নৌকো।

মিতিন পাড় থেকে চেঁচিয়ে এক মাঝিকে ডাকল, "ও দাদা, জোয়ার কতক্ষণ চলবে?"

হাওয়ায় উত্তর ভেসে এল, "আরও ধরুন ঘণ্টাখানেক।"

"ঠিক তো?"

"জলই আমাদের জীবন দিদি। হিসেবে ভুল হয় না।"

এবার যেন মিতিনের ছটফটানি একটু কমল। টুপুরকে বলল, "চল, আগে কিছু খেয়ে নিই।"

কাছেই পরপর বেশ কয়েকটা খাওয়ার হোটেল। বর্ষাকাল বলেই

বোধ হয় ভ্রমণার্থী নেই তেমন, হোটেলগুলো প্রায় মাছি তাড়াচ্ছে। মোটামুটি পছন্দসই দেখে একটায় ঢুকল মিতিন। ইলিশমাছ আর ভাতের অর্ডার দিয়ে কর্মচারীটিকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে লঞ্চঘাট কদ্দুর ভাই?"

"বেশি নয়। জোর হাফ কিলোমিটার।"

"ওখান থেকে কি নৌকো পাওয়া যাবে?"

"নদীতে ঘুরবেন? সামনে থেকেই নৌকো নিন না। চেনা মাঝি আছে, বলে দিচ্ছি। আপনাদের মায়াচর পর্যন্ত বেড়িয়ে আনবে।"

"না গো। আমরা নৌকোয় নুরপুর যাব।"

শুধু টুপুরই নয়, ছেলেটিও এবার যথেষ্ট বিস্মিত। হাতের কাছে লঞ্চ মজুত, তবু নৌকোয় নুরপুর যেতে চায়, এমন যাত্রী বোধ হয় বড় একটা দেখেনি সে। তাও বাড়তি কৌতূহল না দেখিয়ে ছেলেটি বলল, "তা হলে অবিশ্যি লঞ্চঘাটে গিয়েই নৌকো খোঁজা ভাল। ওদিক দিয়ে নুরপুর কাছে হবে।"

"এখান থেকেও নিতে পারি, যদি নুরপুরের কোনও নৌকো মেলে। মানে, যার মাঝি ওদিকেই থাকেন?"

"তেমন কাউকে পাব কি?" ছেলেটা একটুক্ষণ ভাবল, "ঠিক আছে, আপনারা ততক্ষণ খান, আমি দেখছি।"

হ্যাঁ, মিলেছে একজন। সুস্বাদু ইলিশের ঝাল আর গরম-গরম ভাতে পেট টইটম্বুর করে ভোজনালয় থেকে বেরিয়ে টুপুর দেখল, এক বুড়োমতো লোক প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। নুরপুরেরই বাসিন্দা, নাম সনাতন।

মিতিন তো মহাখুশি। বলল, "আমরা কিন্তু সোজা নুরপুর ঘাটে যাব না। আগে গঙ্গা থেকে ভাল করে নুরপুরটা দেখব।"

সনাতন বললেন, "যেমন আপনাদের ইচ্ছে।"

নৌকো থেকে সরু কাঠের তক্তা পেতে দিলেন সনাতন। ঢাল

বেয়ে নেমে, তক্তায় পা রেখে, সন্তর্পণে নৌকোয় উঠল টুপুর-মিতিন। পাটাতনে বাবু হয়ে বসার পর সনাতন নৌকো ছাড়লেন। এখনও জোয়ার চলছে, স্রোতের বিপরীতে যাচ্ছে নৌকো, কসরত করে এগোতে হচ্ছে সনাতনকে। বইঠা বাইছে এক ষোলো-সতেরো বছরের তরুণ, সনাতন হাল ধরেছেন।

আস্তে-আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে গাদিয়াড়া। টুপুর দু' চোখ মেলে তীরভূমিটা দেখছিল। পারের কাছে হাঁটুজলে কী যেন হাতড়াচ্ছে বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল। সকলেরই কোমরে গামছা, জল থেকে কিছু তুলে খপাখপ পুরছে গামছায়।

টুপুর উত্তেজিত মুখে বলল, "ওরা কী ধরছে গো মাঝিদাদা?"

"মীন গো দিদি।"

"মানে মাছ?"

"উঁহু, মাছের চারা।" মিতিন হেসে বলল, "জোয়ারের জলে অজস্র কুচিকুচি মাছ ভেসে আসে। পোনাগুলো ধরে ভেড়ির লোকদের বেচতে পারলে এদের টু পাইস ইনকাম হয়। কত মানুষ এই মীন ধরেই জীবিকানির্বাহ করছে। চিংড়ির বাচ্চাতেই রোজগার সবচেয়ে বেশি।"

"বড় কষ্টের জীবন গো দিদি। দু'টো পয়সা আয় করতে মানুষের ঘাম ছোটার জোগাড়।" সনাতন মাথা দোলালেন, "তা, তোমরা বুঝি গাদিয়াড়া বেড়াতে এসেছিলে?"

"ওই আর কী।" মিতিনই বলল, "যাব নুরপুর। একবার গাদিয়াড়া ছুঁয়ে গেলাম।"

"এখানকার কেল্লাটা দেখেছ?"

"আজ হয়ে উঠল না।" মিতিন টুপুরের দিকে ফিরল, "জানিস তো, গাদিয়াড়ায় লর্ড ক্লাইভের একটা দুর্গ আছে। উঁহু, ছিল। ফোর্ট মর্নিংটন। ব্রিটিশরা বহুকাল আগেই দুর্গটা পরিত্যাগ করে। নদীর বাঁকে

প্রায় হানাবাড়ির মতো পড়ে থাকত দুর্গটা। উনিশশো বিয়াল্লিশের বন্যায় প্রায় চুরমার হয়ে যায়। এখন ওটা শুধুই ধ্বংসস্তূপ।"

কথায়-কথায় রূপনারায়ণ আর গঙ্গার সঙ্গমস্থল এসে গিয়েছে। দু'টো নদনদীর ধারাকে দিব্যি চিহ্নিত করা যায়। যেখানে নদনদী দু'টো মিশেছে, সেখানে স্রোতটাও কেমন এলোমেলো। ঘূর্ণিতে নৌকো প্রায় পাক খেয়ে যাচ্ছিল। দক্ষ হাতে সামলে নিলেন সনাতন। এবার ভাগীরথী বেয়ে চলেছেন। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে নুরপুর, কাছে আসছে। পশ্চিমে দামোদর নদও দৃশ্যমান। ভাগীরথী যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার খানিক আগে দামোদরের মোহনা।

হঠাৎই টুপুরের নজরে পড়ল, তীব্রবেগে ধেয়ে আসছে একটা স্পিডবোট। ডায়মন্ডহারবারের দিক থেকে। ভাগীরথীকে চিরে শাঁ শাঁ ঢুকে গেল রূপনারায়ণে। উথলে ওঠা ঢেউ এসে ছলাৎ ধাক্কা মারল টুপুরদের নৌকোয়, টলমল দুলে উঠল তরণী। ঝলক জলও ছিটকে এল টুপুরদের মুখে-চোখে।

সনাতন বিরক্ত মুখে বললেন, "এই এক কায়দা হয়েছে। আজকাল বোটগুলোর ছোটাছুটির কোনও বিরাম নেই।"

স্পিডবোটটাকে চোখ কুঁচকে দেখছিল মিতিন। বলল, "সংখ্যায় এরা বুঝি বেড়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ গো দিদি। সময় নেই, অসময় নেই, সারাক্ষণ দাপাচ্ছে। রাতেও তো চরে বেড়ায়।"

"ওগুলো কাদের বোট? পুলিশ?"

"না গো। পেরাইভেট পার্টির। আমোদ-ফুর্তি করতে আসে নদীতে।" সনাতন হাল সামান্য ঘোরালেন, "তোমরা নুরপুরঘাটেই নামবে তো?"

"এক্ষুনি নামছি না।" মিতিন ফের গুছিয়ে বসল, "আগে নুরপুরের আশপাশটা একটু ঘুরে-ঘুরে দেখি।"

"নুরপুরে দেখার কী-ই বা আছে গো দিদি! ওই এক লাইটহাউস, আর বাঁধের মুখটায় কন্ধকাটা সাহেব-মেমসাহেবের সমাধি। তা, সেই সমাধি দেখতে হলেও তো নৌকো থেকে নামতে হবে। তখন খ্রিস্টানদের অনাথ আশ্রমটাও ঘুরে আসতে পার।"

"গঙ্গার ধারে একটা প্রাচীন বাড়ি আছে বলে শুনেছি?"

"কোনটা? কলকাতার বাবুদের বাড়িটা? যেখানে ক'দিন আগে ধনরত্ন নিয়ে হুলস্থূল হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ গো। ওই বাড়িটাও একবার নদী থেকে দেখব।"

"কেন?"

"এমনিই।"

"বুঝেছি, তুমি খবরের কাগজের লোক।" হঠাৎ যেন গোপন কিছু আবিষ্কার করে সনাতনের চোখ জ্বলজ্বল, "বেশ তো, চলো। একদম ধার দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

জোয়ার শেষ, জল এখন প্রায় স্থির। নৌকো চলেছে নিন্‌হো অভিমুখে। সনাতনের সহকারী কিশোরটি বইঠা টানছে ছপাৎ-ছপ। হঠাৎ উৎসাহিত মুখে চেঁচিয়ে উঠল, "হুই বাড়িটা দেখা যায়।"

টুপুরেরও গোচরে এল। অস্ফুটে বলল, "বাড়িটা নদী থেকে কতটা উঁচুতে গো মিতিনমাসি!"

ভ্যানিটিব্যাগ খুলে ছোট্ট বাইনোকুলার বের করল মিতিন। চোখে লাগিয়ে বলল, "হুঁ, একটু বেশি উঁচুতে।"

"হাইটের জন্যই কি বাড়িটা গঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে?"

"হতে পারে।" বাইনোকুলারে দৃষ্টি রেখেই মিতিন সনাতনকে জিজ্ঞেস করল, "ও বাড়ির কারওর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি?"

"একজনকে তো নুরপুরের সবাই চেনে। পুরুতমশাই। বড় অমায়িক মানুষ গো! সবার সঙ্গে গপ্পো করে।"

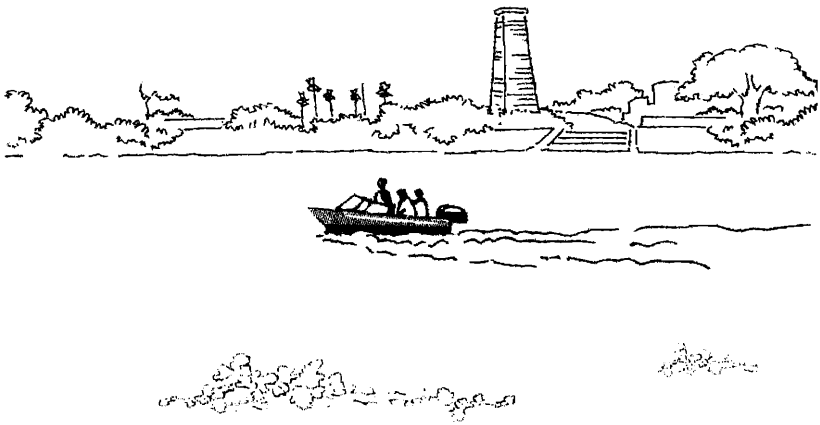

"ও বাড়ির ইতিহাস কিছু জানা আছে?"

"বড় মানুষদের ঘরের কাহিনি আমরা গরিবগুরবোরা কোত্থেকে জানব দিদি? তবে দেশে-ঘরে তো অনেক উপাখ্যানই বাতাসে ভাসে। শুনেছি, যে-সাহেবের কাছ থেকে বাবুরা বাড়িটা কেনেন, তিনি মোটেই সুবিধের লোক ছিলেন না।"

"কীরকম?"

"সাহেব নাকি খুব অত্যাচারী ছিলেন। দলবল নিয়ে যেই না গাঁয়ে ঢুকতেন, অমনি লোকে দুদ্দাড়িয়ে পালাত। কচিকাঁচারা এত ভয় পেত যে, একবার দৌড় লাগালে আর ঘরেই ফিরত না।"

"তা অত্যাচারটা কী করতেন?"

"অত বলতে পারব না। লুঠপাট চালাতেন বোধ হয়।"

"কলকাতার বাবুরা নিশ্চয়ই সেরকম নন?"

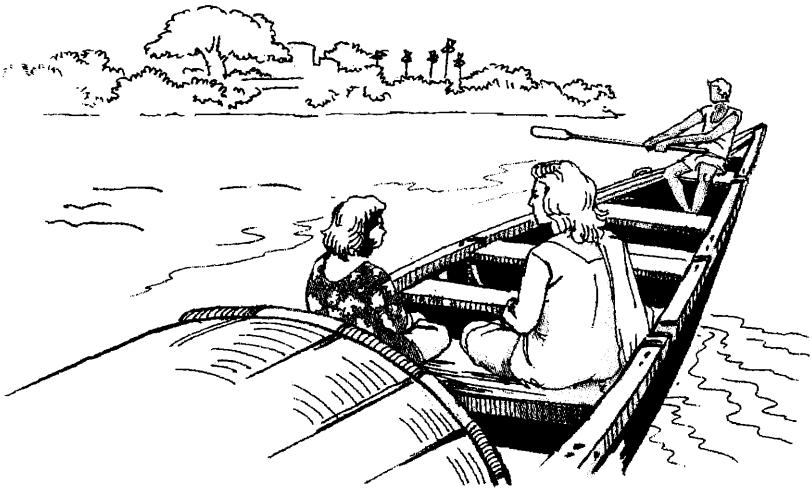

"তেমন কোনও বদনাম কানে আসেনি। ওঁরা তো আর থাকেনও না। তবে ইদানীং নাকি এক বাবু এসে রয়েছেন।"

নৌকো পৌঁছে গিয়েছে বাড়ির একদম কাছে। কালকের কাদা-ভরা তীর জলে থইথই। লকগেট পর্যন্ত চলে গিয়েছে জল। লোহার দরজার অন্তত ফুটপাঁচেক এখন জলের তলায়।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মাঝিভাই, লকগেটটা কি পুরোপুরি ডোবে কখনও?"

"খুব কম। বছরে জোর এক-আধদিন। ওই...বড় বান-টান এলে।"

"তখন কি লকগেট এরা খুলে দেয়?"

"কই আর? বন্ধই তো আছে বরাবর।"

"কখনও খুলতে দেখেননি? ভাল করে স্মরণ করুন।"

"না গো দিদি। কম করে পঞ্চাশ বছর নৌকো বাইছি, গেট কখনও খোলা হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। তবে সামনেটা কাদা জমে একেবারে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, পরিষ্কার করার পর চেহারা ফের খোলতাই হয়েছে।"

"কবে পরিষ্কার হল?"

সনাতন একটু ভেবে বললেন, "তা এক বছর তো হবেই। গত জষ্টিতে। জল তখন অনেক কম ছিল নদীতে। দশ-বারোটা শ্রমিক তিনদিন ধরে কাদাটাদা ছাড়াল। সেই মাটি গেল পাশে রতনবাবুর ইটভাঁটায়!"

অলস গতিতে দুলে-দুলে বাড়িখানা পেরোল নৌকো। অল্প একটু এগিয়ে মিতিন বলল, "এখানেই পাড়ে নৌকো ভেড়ানো যায় না মাঝিভাই?"

"কেন, ঘাটে যাবেন না?"

"থাক। অদ্দুর আর টানার দরকার নেই। আবার পিছনে যাওয়া...!"

"তবে রতনবাবুর ঘাটেই বাঁধি?"

"সে আপনার যেমন সুবিধে।"

নৌকো থেকে নেমে সামান্য অস্বস্তিতে পড়ে গেল টুপুর। ইটভাঁটার কর্মীরা কাজ থামিয়ে হাঁ করে দেখছে তাদের। দু'জন ফিটফাট শহুরে মহিলা নদীপথে এসে ইটভাঁটায় অবতরণ করছে, এমন দৃশ্য তাদের কাছে বোধ হয় অভাবনীয়।

মিতিনের ভ্রুক্ষেপ নেই। সনাতনের টাকা মিটিয়ে উঠল পাড়ে। গায়েই মীনধ্বজদের পাঁচিল, চলল তার গা ঘেঁষে। তিরিশ-চল্লিশ পা গিয়ে থামল হঠাৎ। ঝুঁকে মাটি থেকে দু'খানা জীর্ণ পলিথিনের বস্তা তুলল। ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। বস্তা দু'টো দেখল উলটে-পালটে।

টুপুর চোখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী আছে গো এতে?"

মিতিনের ঠোঁটে অর্থপূর্ণ হাসি, "মাটি!"

"তা ইটভাঁটায় তো মাটিই থাকবে।"

মিতিন আর কিছু বলল না। মাথা নিচু করে হাঁটছে ফের। ইটভাঁটার সীমানা পেরিয়ে উঠল বাঁধের রাস্তায়। বাঁয়ে ঘুরে মীনধ্বজদের গেটে গেল।

মোবাইল ফোনে ডাক দিতেই মীনধ্বজ সশরীরে হাজির। ব্যস্তভাবে বললেন, "এ কী, আজ আবার আসছেন, জানাননি কেন?"

মিতিন একগাল হাসল, "সারপ্রাইজ ভিজিটের মজাই আলাদা।"

গেট খুলে মীনধ্বজ ইতিউতি তাকালেন, "আপনাদের গাড়ি কোথায়?"

অম্লানবদনে মিথ্যে বলল মিতিন, "আজ বাসে এলাম।"

পাক্কা বারো ঘণ্টার সফর সেরে টুপুর আজ কুপোকাত। ওঃ, একখানা দিন গেল বটে! সেই সকালে রওনা দিয়ে গাদিয়াড়া হয়ে নুরপুর, তারপর মীনধ্বজবাবুর বাড়ি ঘণ্টাতিনেক নানান অনুসন্ধান চালাল মিতিনমাসি। টুপুরকেও শাগরেদি করে যেতে হল। শেষে সত্যি-সত্যি বাস ধরে প্রত্যাবর্তন। একই দিনে ট্যাক্সি, ট্রেন, অটোরিকশা, নৌকো, বাস—শুধু উড়োজাহাজটাই যা হয়নি। বাসেই ধকল গেল সবচেয়ে বেশি। বড্ড ঢিকুর-ঢিকুর চলে, একবার দাঁড়ালে আর নড়তেই চায় না। নুরপুর থেকে তারাতলা প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগিয়ে

দিল! তারাতলায় ট্যাক্সি নিয়ে টুপুর যখন ঢাকুরিয়া পৌঁছল, তখন সব দম নিঃশেষ।

পার্থ আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে। আরতিকে ছুটি দিয়ে নিজেই বানিয়েছে রাতের খানা। আলুর দম, চিকেন-ভর্তা আর পরোটা। বুমবুমকে খাইয়েও দিয়েছে সময়মতো। টুপুর-মিতিনের বিধ্বস্ত দশা দেখে বুঝি মায়া জাগল, ঝটাপট সাজিয়ে ফেলল টেবিল। টুপুরকে বলল, "আয় রে, ওস্তাদ শেফের হাতের রান্না খেয়ে আজ তোদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হোক।"

চিকেন-ভর্তাটা পার্থমেসো ভালই বানায়, আগেও খেয়েছে টুপুর। আলুর দমটাই তাই চাখল প্রথমে। জিভে ঠেকিয়েই বলল, "দারুণ! নারকোল তো দিয়েছ, সঙ্গে পোস্ত আছে মনে হচ্ছে?"

"ইয়েস। এটা মুঘলাই আলুর দম। জানিস তো, মুঘলদের সব খানাতেই অল্পবিস্তর পোস্ত থাকত?"

"আমি তো জানতাম আফগানিস্তানে খুব পোস্তর চাষ হয়।"

"আরে, সেই জন্যই তো! মুঘলরা কোন রাস্তা দিয়ে ভারতে ঢুকেছিল, অ্যাঁ? বাবর তো অরিজিনালি কাবুলেরই রাজা ছিলেন।" পার্থ মুখে একটা গাম্ভীর্য ফোটাল, "যাক গে, আজ তোদের এক্সপিডিশন কেমন হল বল?"

সংক্ষেপে বর্ণনাটা সারল টুপুর। নৌকোয় বসে লকগেট দর্শন, ইটভাঁটা হয়ে মীনধ্বজদের গৃহে প্রবেশ, মীনধ্বজ-করুণা-অনঙ্গমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্ব, খোঁড়াখুঁড়ির জায়গাটা আবার পর্যবেক্ষণ, বেসমেন্টে মিতিনমাসির উত্তেজিত পদচারণা, বেরনোর মুখে সন্দীপনের সঙ্গে ঝলক মোলাকাত— সবই বলল আলগা-আলগা ভাবে। শুধু ইলিশ ভক্ষণটাই চেপে গেল, পাছে পার্থমেসো দুঃখ পায়।

কথার মাঝেই মিতিনও স্নান সেরে হাজির। চিকেনটা শুঁকল

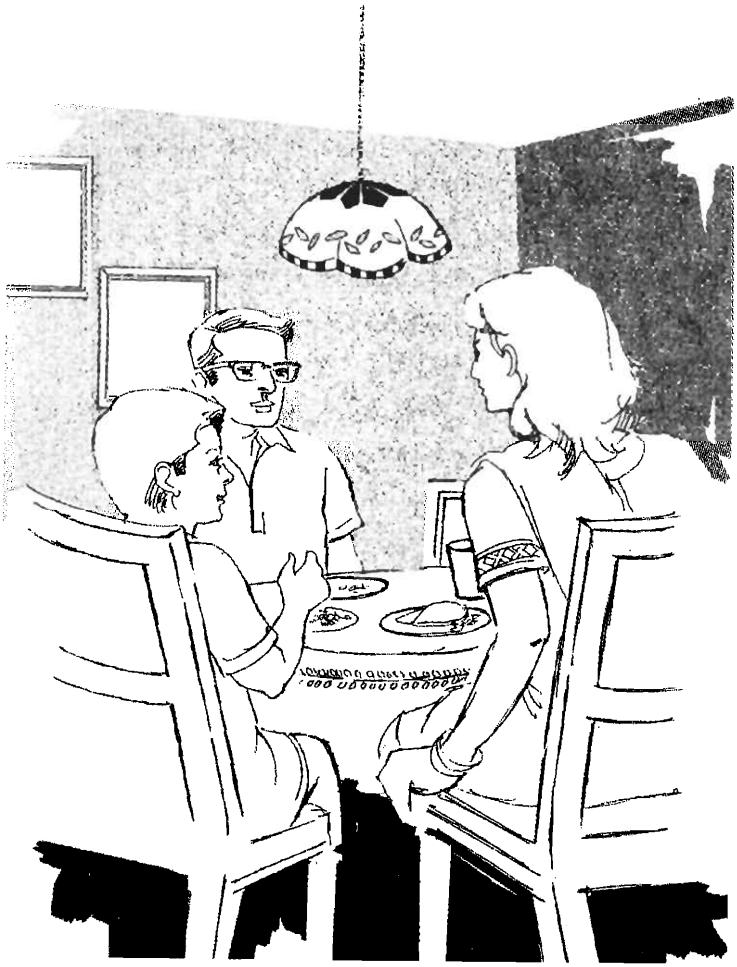

একটু, তারপর একখানা পরোটা আঙুলে ঝুলিয়ে নিরীক্ষণ করল।

পার্থ ভুরু নাচিয়ে বলল, "কেমন দেখছ?"

"ভারতের ম্যাপ হয়নি। মেরেকেটে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র বলা যায়।"

"শুধু শেপটাই দেখলে?" পার্থ রীতিমতো আহত, "কীরকম মুচমুচে হয়েছে দ্যাখো!"

ছোট্ট একখানা টুকরো দাঁতে ছিঁড়ে অনেকক্ষণ ধরে পাকলে-পাকলে খেল মিতিন। অধীর চোখে মতামতের জন্য অপেক্ষা করছে পার্থ। মিনিটদুয়েক পর মিতিনের উদাসীন তারিফ, "ওকে! খিদের মুখে চলে যাবে।"

পার্থ ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "এই তো তোমাদের দোষ। প্রাণ খুলে প্রশংসা পর্যন্ত করতে পার না। রান্নাটা তো ছেলেদের হাতেই বেশি খোলে, এটা মানতেও মেয়েদের আপত্তি!"

মিতিন খিলখিল হেসে উঠল। ওই হাসিই বুঝি বলে দিল, তার সারাদিনের ক্লান্তি কেটে গিয়েছে। গপাগপ খাওয়া সেরে ঝপাঝপ বানিয়ে ফেলল তিনকাপ কফি। টুপুর বিছানায় যাওয়ার উদ্‌যোগ করছিল, তাকে পাকড়াও করে বসাল সোফায়। হাতে গরম কফি ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এক্ষুনি শুলে চলবে? পরীক্ষা দিতে হবে না?"

"কীসের পরীক্ষা?"

"সারাদিন যে সঙ্গে ঘুরলি, কদ্দুর কী বুঝলি শুনি?"

টুপুর ঈষৎ চাঙা বোধ করল। মিতিনমাসি তাকে গুরুত্ব দিলে নিজেকে বেশ ওয়াট্‌সনের মহিলা সংস্করণ বলে মনে হয়। ঠোঁট কামড়ে বলল, "অনেক নতুন তথ্যই ভাঁড়ারে এল আজ। কোত্থেকে শুরু করি?"

"যেখান থেকে খুশি।"

"প্রথমে করুণার প্রসঙ্গে বলি?"

"বল।"

"করুণা আগের দিন জানায়নি মীনধ্বজবাবুর বাড়িতে ওর বরের যাতায়াত আছে।"

"বরের নামটা কী?"

"গোবিন্দ। সন্দীপনবাবু ওকে দিয়েই বাড়ির ঝোপঝাড় পরিষ্কার করান।"

"সুতরাং বাড়ির চারপাশটা গোবিন্দ ভালই চেনে।" অভিমত ছুড়ে পার্থ কফি নিয়ে বলল, "তাই তো?"

"অবশ্যই। আর সেই কারণেই অন্ধকারে খোঁড়াখুঁড়ির স্পটটা খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে কঠিন নয়। অতএব পরেরবার যে দু'টো লোক হানা দিয়েছিল, গোবিন্দ তাদের একজন হলেও হতে পারে।"

"হুম।" মিতিন মাথা দোলাল, "তারপর?"

"অনঙ্গমোহনবাবুর ঠাকুরদার বাবা নিন্‌হো-তে বছরকয়েক বাস করেছিলেন। সিংহধ্বজের সঙ্গে তাঁর ভালই ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভুজঙ্গমোহন ছিলেন একজন জ্যোতিষী, অনেক ব্যাপারেই সিংহধ্বজ তাঁর পরামর্শ মেনে চলতেন। সিংহধ্বজকে পাকাপাকি বসবাসের দিনটা তিনিই স্থির করে দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ওখানে প্রবেশের আগে সিংহধ্বজের মৃত্যু হয়।"

পার্থ ফোড়ন কাটল, "এই জায়গাটায় একটু প্যাঁচ আছে মনে হচ্ছে!"

মিতিন চোখ নাচিয়ে বলল, "কী প্যাঁচ?"

"সিংহধ্বজের মৃত্যুটা অস্বাভাবিক নয় তো? হয়তো ভুজঙ্গমোহনই তাঁকে...!"

"তুত, গুলিয়ে দিয়ো না তো! সিংহধ্বজ মারা যান বাগবাজারের বাড়িতে। হৃদ্‌রোগে। মোরওভার, ভুজঙ্গমোহন তাঁকে অযথা খুন করবেনই বা কেন?"

"মোটিভ তৈরি করাই যায়।" পার্থ নড়েচড়ে বসল, "যদিও গুপ্তধনের তত্ত্বে আমি এখনও বিশ্বাস করছি না, তবু ধরো, পর্তুগিজ বণিকটি তাঁর সব সোনাদানা নিয়ে যেতে পারেননি। জলদি-জলদি কেটে পড়ার তাড়ায় কিছু হয়তো গোপন জায়গায় রয়েই গিয়েছে। হয়তো সিংহধ্বজ কোনওভাবে সেই স্থানটির সন্ধান পেয়েছিলেন। এবং বিশ্বাস করে ভুজঙ্গমোহনকে বলেও ফেলেছিলেন, অবশ্যই স্থানটির সঠিক অবস্থান না জানিয়ে। ভুজঙ্গমোহন হয়তো তখন ওই বাড়িতেই ছিলেন, অথবা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। তিনিই হয়তো লোভে পড়ে সিংহধ্বজকে হত্যা করে...। পরে নিজেও তিনি ওই গুপ্তধন খুঁজে পাননি। তাই মরার আগে ছেলেকে গল্পটা বলে যান। সেই ছেলে বলেন তাঁর ছেলেকে...। এভাবেই হয়তো বংশপরম্পরায় কাহিনিটি চলছে। অনঙ্গমোহনের বাপ-ঠাকুরদা হয়তো রাষ্ট্র করে বেড়ানননি, এখন পেটপাতলা অনঙ্গমোহনের দৌলতে সবাই জেনেছে।"

"খুবই কষ্টকল্পনা। তবে উড়িয়ে দিচ্ছি না। মাথায় রাখব।" মিতিন কথাটা ভাসিয়ে ফের টুপুরে ফিরল, "আর কী কী জানলি আজ?"

"চোদ্দো মাস আগে লকগেটের কাদা সাফ হয়েছে।"

"আর?"

"লকগেট আদৌ খোলা হয় না। জল বাড়লেও ক্বচিৎ কখনও পুরোটা ডোবে।"

"নেক্সট?"

"সন্দীপনবাবু দায়িত্ব নিয়ে কাদা পরিষ্কারের কাজটা করিয়েছিলেন। তবে তার আগে ফোনে মীনধ্বজবাবুর অনুমতি

নিয়ে নেন। কাদা সরাতে সন্দীপনবাবুর সাত হাজার মতো টাকা খরচ হয়েছিল। আর কাদামাটি বিক্রি করে তিনি আটশো টাকা পান। পাশ বইয়ে হিসেব আছে।"

"হুঁ। তারপর?"

"আর কী?" টুপুর মাথা চুলকোল, "তেমন কিছু তো...!"

"স্মৃতিশক্তিকে আরও প্রখর কর। তোর মেসোর মতো শুধু শব্দজব্দ করে কিস্‌সু হবে না। প্রতিটি ডাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ মনে রাখার একটা প্রসেস আছে। সময়ের উলটো দিকে ধাপে-ধাপে এগোতে হয়। অর্থাৎ দিনের শেষ থেকে ক্রোনোলজিক্যালি শুরুতে যাওয়ার চেষ্টা করবি। প্রথমে শুধু আজকের দিনটা। তারপর আজ আর গতকাল। তারপর আজ কাল পরশু। বুঝলি?"

"হুঁ।"

"এবার বল, মীনধ্বজবাবু আজ কী জানালেন?"

"কী?"

"কানাডার বাড়িটা এখনও বিক্রি করেননি। সেপ্টেম্বর মাসে আবার ওয়াটারলু যাচ্ছেন। তখন বাড়িটাও বেচবেন, ছেলেমেয়ের কাছেও মাস তিন-চার কাটিয়ে আসবেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলেন তো। কিন্তু এই কেসের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক?"

"হয়তো আছে। হয়তো নেই। তবে তথ্যটা তো মাথায় রাখতে হবে।" মিতিন ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল, "আচ্ছা, একটা ব্যাপার তুই লক্ষ করেছিস?"

"কী গো?"

"খুব ইন্টারেস্টিং। পিছনের ফটক থেকে গঙ্গার দিকে মুখ করলে লকগেটখানা বেশ খানিকটা বাঁয়ে।"

পার্থ বলল, "ও তো কালই দেখেছি।"

"আর যে স্পটটা খোঁড়া হয়েছিল, সেটা কিন্তু একদম লকগেটের সোজাসুজি।"

"তাই নাকি? তো?"

"ভাবছি কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক কি একেবারেই নেই?"

"এ তো আমার গল্পের চেয়েও আষাঢ়ে কল্পনা ম্যাডাম ডিটেকটিভ।" সুযোগ পেয়ে পার্থ একটু খোঁচা দিয়ে নিল, "ভুতুড়ে শব্দ-টব্দের ব্যাপারে আর এগোতে পারলে? কাল আর নতুন কিছু ঘটেছে?"

"নাঃ। ডিটেকটিভ দেখলে ভূতরা তফাতে সরে যায়। সাপে-নেউলে সম্পর্ক তো!"

টুপুর হেসে ফেলল। মীনধ্বজদের বাড়ির একটা দৃশ্য মনে পড়ল হঠাৎ। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মিতিনমাসি, তুমি বেসমেন্টে তখন ওভাবে হাঁটছিলে কেন? প্যাসেজের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পা গুনে-গুনে যাচ্ছ, ফিরছ? বেসমেন্টের চাতালে নেমেও ঘাড় উঁচিয়ে ঘর তিনখানা বারবার করে দেখছিলে?"

"নির্মাণের কারিকুরিটা বুঝতে চাইছিলাম।" কপালে টকটক টোকা মারল মিতিন। ঝপ করে তর্জনী তুলে বলল, "ওয়ান মোর থিং। মীনধ্বজবাবুর বাড়ি আর রতনবাবুর ইটভাঁটার মাঝের পাঁচিলটা কিন্তু কমন।"

টুপুর বলল, "হ্যাঁ তো!"

"এবং পাঁচিলের হাইট সাত-আট ফুটের বেশি নয়।"

"তুমি কি বলছ চোর দু'টো ওই পাঁচিল ডিঙিয়েই গুপ্তধন খুঁজতে এসেছিল?"

"কীসের সন্ধানে এসেছিল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে স্পটটায় পৌঁছনোর ওটাই সহজতম রুট। নয় কি? আর পালানোর সময় তো দৌড়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে, হাত পনেরো-বিশ সাঁতার কেটে, ইটভাঁটায় উঠে হাওয়া মারা যায়।"

"ওঃ, তোমাদের গবেষণা এবার থামাবে?" পার্থ কফির কাপ সিঙ্কে রেখে এসেছে। লম্বা হাই তুলে বলল, "যেখানে গুপ্তধনই নেই, সেখানে কে ঢুকল, কে বেরোল, কে খুঁড়ল, কে পালাল, তাতে কী যায় আসে? সবই তো মিনিংলেস।"

"গুপ্তধন মানে কি শুধু সোনাদানা আর মোহর?" মিতিন পালটা প্রশ্ন হানল, "অন্য কিছু কি হতে পারে না?"

"দুনিয়ায় আর কী বহুমূল্য আছে ম্যাডাম?"

"সেটাই তো ঠাহর করার চেষ্টা করছি।"

"চালিয়ে যাও।" পার্থ আবার হাই তুলল, "আমি শুতে চললাম।"

"এই দাঁড়াও, দাঁড়াও। কথা আছে।" মিতিন তাড়াতাড়ি পার্থকে আটকাল, "তোমার বন্ধু অরুণাভ পুরনো নিউজপেপার জমায় না?"

"ওটাই তো ওর রিসার্চের টপিক। ভারতের সংবাদমাধ্যমের ক্রমবিকাশ। অরুণাভ তো হিকির গেজেটেরও ফটোকপি রেখেছে।"

"গুড। কাল তো ছুটি, সকালে ওর বাড়ি গিয়ে পুরনো দিনের নিউজ একটু ঘেঁটে এসো তো। নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরিতে অল্‌মিডা নামের কোনও ব্যবসায়ী...!"

"বলতে হবে না, বুঝে গিয়েছি।" পার্থ তৃতীয় হাইটি তুলল। ঘরে যেতে-যেতে বলল, "ডোন্ট ওরি, কিছু যদি থাকে, ঠিক জোগাড় করে আনব।"

পার্থ চলে যাওয়ার পরও মিতিন বসে থাকল চুপচাপ। টুপুরেরও ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু মিতিনমাসিকে ছেড়ে উঠতে পারল না। কী ধরনের গুপ্তধনের কথা ভাবছে মিতিনমাসি? কোনও যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক ফর্মুলা? হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন পুঁথি? অথবা বিখ্যাত শিল্পীর দুষ্প্রাপ্য কোনও ছবি? কিন্তু সেসব কি মাটিতে পুঁতে রাখা

সম্ভব? এক, যদি কোনও বাক্সে পুরে...। অল্‌মিডার সময় থেকেই কি রাখা আছে? নাকি শিখিধ্বজ বা সিংহধ্বজ...?

ভাবনাটাকে চমকে দিয়ে হঠাৎ মিতিনমাসির গলা, "আমার মোবাইলটা নিয়ে আয় তো।"

"এত রাতে কাকে ফোন করবে গো?"

"আমাদের ভেল্টুদাকে। গেঁওখালির যে ছেলে দু'টো ধরা পড়েছিল, তাদের একটু ট্রেস করতে চাই।"

"কেন? ওরা আর কী কাজে লাগবে?"

"কিছু কি বলা যায় রে! হয়তো ওরাই এই রহস্যের মিসিং লিংক।"

অর্থটা ঠিকঠাক হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না টুপুর। কোন মিসিং লিংকের কথা বলছে মিতিনমাসি?

স্বাধীনতা দিবসের সকালে মনমেজাজ বেশ ফুরফুরে থাকে টুপুরের। ঘুম ভাঙে প্রভাতফেরির আওয়াজে, ড্রাম বাজাতে-বাজাতে পাড়া পরিক্রমা করে ক্লাবের ছেলেমেয়েরা। কানে আসে দেশাত্মবোধক সংগীতের সুর, সমবেত গানের মূর্ছনায় মুখরিত হয়ে ওঠে আকাশ-বাতাস। টুপুরও বেরিয়ে পড়ে চটপট। পাড়ায় জাতীয়পতাকা উত্তোলনের পর সোজা স্কুল। সেখানে একটা অনুষ্ঠান হয় ফি বছর। গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক। ফাংশন শেষে লুচি-বোঁদের প্যাকেট সাবাড় করতে-করতে হল্লাগুল্লার আনন্দও নেহাত কম নয়।

তা এ বছর তো টুপুর মাসির বাড়িতে। রুটিনটাও তাই অন্যরকম। ভোরবেলা ফিটফাট হয়ে বুমবুমদের স্কুলে গেল টুপুর। ভাইয়ের খুদে গার্জেন বনে। সাড়ে দশটা নাগাদ ফিরে দেখল, পার্থমেসো নেই। আরতিদি যথারীতি কাজে ব্যস্ত, আর অস্বাভাবিক গম্ভীর মিতিনমাসি সোফায় আসীন।

টুপুর চোখ নাচিয়ে বলল, "কী গো, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে-তে প্যাঁচার মতো মুখ কেন?"

ভারী গলায় মিতিন বলল, "কেসটা বড্ড তাড়াতাড়ি পেকে গেল রে।"

"মানে?"

"মীনধ্বজবাবুর ফোন এসেছিল। কাল রাতে ও বাড়িতে আবার একটা ইন্সিডেন্ট ঘটেছে।"

"কীরকম?"

"রাত তিনটে নাগাদ মীনধ্বজবাবু বাথরুম যাওয়ার জন্য উঠেছিলেন। তখনই হঠাৎ শব্দ পেয়ে জানলা দিয়ে দেখেন, পিছনের গেট টপকে জনাপাঁচেক লোক ঢুকছে বাড়িতে। জানলা থেকেই চেঁচিয়ে ওঠেন মীনধ্বজবাবু, লোকগুলোও তৎক্ষণাৎ সটকান দেয়। চটপট চাতালে নেমে মীনধ্বজ দেখেন, একটা স্পিডবোড বিকট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বাঁয়ে, মানে ডায়মন্ডহারবারের দিকটায়।"

টুপুর স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। বিড়বিড় করে বলল, "কী সাংঘাতিক কাণ্ড!"

"হুম।"

"লোকগুলো ডাকাতটাকাত নাকি? গুপ্তধনের খবর পেয়ে চড়াও হয়েছিল?"

"অনেকটা সেরকমই লাগছে বটে। তবে...।" মিতিন একটুক্ষণ

চুপ থেকে বলল, "যদি ডাকাতই হয় তো দুদ্দাড়িয়ে পালাবে কেন? ওই নির্জন জায়গায় মীনধ্বজবাবু গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। আর একটা ছেষট্টি বছরের লোককে মেরেধরে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে চলে যাওয়া ডাকাতদের পক্ষে কী এমন কঠিন?"

"তা হলে কি ওরা চোরটোরই...?"

"চোর-ছ্যাঁচোড় কি দলবেঁধে আসে রে? তাও আবার স্পিডবোট নিয়ে?"

"ডাকাতও নয়, চোরও নয়, লোকগুলো তা হলে কী? নিশ্চয়ই ওরা রাত তিনটেয় নিন্‌হোর চাতালে আড্ডা জমাতে আসেনি?"

"হুঁ, ওদের উদ্দেশ্যটাই তো ভাবছি।"

"আমি কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মানতে পারছি না মিতিনমাসি।"

"কী?"

"কেন যে মীনধ্বজবাবু জেদ করে একা-একা আছেন? সন্দীপনবাবু বাড়িতে থাকলে কত সুবিধে হয়।" বলেই টুপুর একটু দম নিল, "অবশ্য দলবেঁধে এলে ওঁরা দু'জনেই বা কী করবেন?"

"বটেই তো। তবে মীনধ্বজবাবু এবার খুব ঘাবড়েছেন। সকাল হতে না-হতেই ডেকেছিলেন সন্দীপনকে। শুনে-টুনে সন্দীপনও নাকি ভীষণ উদ্বিগ্ন। সে নাকি বলেছে, আর কোনও ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই। যত শিগগির সম্ভব সে গেটে বন্দুকধারী নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করছে। সামনে-পিছনে, দু'দিকেই।"

"মীনধ্বজবাবু রাজি তো?"

"মনে তো হল পরামর্শটা এবার শুনবেন। আমাকেও জিজ্ঞেস করছিলেন, কী করা উচিত?"

"তুমি কী বললে?"

"সিকিউরিটির বন্দোবস্ত তো যখন-তখন করা যায়। তবে আমি এক্ষুনি-এক্ষুনি তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছি।"

"কিন্তু এর পর যদি মারাত্মক কিছু ঘটে যায়?"

"উহুঁ, ঘটবে না। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে...!"

মিতিন ঝুপ করে থেমে গেল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ঠিক কী বলছে আর জানা হল না টুপুরের। ঠোঁটে কুলুপ আঁটলে মাসির পেট থেকে কথা বের করা শিবেরও অসাধ্য। তবে ভাবনাচিন্তার একটা জটিল প্রক্রিয়া যে মিতিনমাসির মস্তিষ্কে চালু হয়ে গিয়েছে, তাতে টুপুরের সন্দেহ নেই।

অগত্যা টুপুরের আর কাজ কী, ভ্যাবলার মতো বসে থাকা ছাড়া?

সময় কাটাতে টিভি চালাল টুপুর। ঘুরছে এ চ্যানেল, ও চ্যানেল। বেশিরভাগ চ্যানেলেই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের ঘটা এখন। কোথাও দেশপ্রেমের সিনেমা দেখাচ্ছে, কোথাও গান, কোথাও কুইজ। দূরদর্শনে চলছে সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ। জঙ্গি হানার আশঙ্কায় দেশের সর্বত্রই এখন কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দু'-চার হাত অন্তর-অন্তর কমান্ডোর প্রহরা। তাদের সতর্ক চোখ ঘুরছে এদিক-ওদিক।

অনুষ্ঠানটার মাঝেই পার্থমেসো ফিরে এসেছে। ঢুকেই টুপুরকে বলল, "তোর মাসিকে আমার ফিজ রেডি করতে বল।"

"কীসের?"

"একটা সকালের মধ্যে এত কিছু ইনফর্মেশন জোগাড় করলাম, তার মূল্য দিতে হবে না?"

মিতিন প্রায় ধ্যানস্থই ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "আগে শুনি তো। দেখি কতটুকু কী কাজে লাগে।"

"ব্যবহার করতে পারবে কি না সেটা তোমার সমস্যা। তবে

তথ্যগুলো দারুণ ইন্টারেস্টিং।" ধপাস করে সোফায় বসে একখানা সিগারেট ধরাল পার্থ। পোড়া কাঠি অ্যাশট্রেতে গুঁজে বলল, "নুরপুর ছিল এক পিকিউলিয়ার জায়গা। একদিকে ডায়মন্ডহারবারে ব্রিটিশদের ফোর্ট, এক সময় যার নাম ছিল 'চিংড়িখালি গড়'। অন্যদিকে ফলতায় ডাচদের দুর্গ, সিরাজদ্দৌলার হাতে মার খেয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। অবশ্য তার আগেই ডাচরা ওই দুর্গ থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। এই দুই দুর্গের মাঝে নুরপুর ছিল হার্মাদদের ঠেক। হার্মাদ মানে জানিস তো টুপুর?"

"জলদস্যু!"

"ইয়েস। স্প্যানিশ শব্দ আর্মাডার অপভ্রংশ হল 'হার্মাদ'। আর্মাডার অর্থ হল 'নৌবহর'। তা যাই হোক, দেড়-দু'শো বছর ওই পর্তুগিজ জলদস্যুরা নুরপুরকে সেন্টার করে তাদের লুঠপাট চালাত। এইটিন্থ সেঞ্চুরির শেষের দিকে ব্রিটিশরা তাদের হঠিয়ে দেয়। তবে এক-দু'জন ব্রিটিশদের সঙ্গে ভাবটাব জমিয়ে রয়ে গিয়েছিল নুরপুরে। সেই রকমই এক হার্মাদ বেসিল ডি অল্‌মিডা ওখানে একটা নতুন ব্যবসা ফেঁদে বসে। খুব অভিনব নয় অবশ্য, এই কাজ তারা ভারতবর্ষে আগেও করেছে। ভারতের বাইরেও। হঠাৎ-হঠাৎ গ্রামে হানা দিয়ে ছেলে-বুড়ো-জোয়ান যাদেরই হাতের কাছে পেত, তুলে এনে বিদেশে চালান করত দাস হিসেবে। বেসিল প্রধানত এদের পাচার করত ওয়েস্ট ইন্ডিজে। ওখানকার গায়না, ত্রিনিদাদ, অনেক জায়গাতেই তখন ব্রিটিশ শাসন। ওইসব ব্রিটিশরাই কিনে নিত লোকগুলোকে, তাদের দিয়েই বানাত বাড়িঘর রাস্তাঘাট।"

মিতিন বলল, "বাজে কথা ছেড়ে পয়েন্টে এসো।"

"আরে বাবা, আসছি তো।" পার্থ ছাই ঝাড়ল, "কুইন ভিক্টোরিয়া ভারতের ভার নেওয়া পর্যন্ত এই ব্যবসাটি রমরমিয়ে চলেছে।

তারপর ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে এই দাস-চালান নিয়ে খুব ঝড় ওঠে। অগত্যা ব্যবসাটাও শেষমেশ বন্ধ করতে হয়।"

"ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডা সম্পর্কে কী জানলে?"

"ওই নামটা পাইনি। বোধ হয় ফ্রান্সিস ছিল বেসিলের ছেলে। ওর সময়েই সম্ভবত ওই পাপ ব্যবসার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।"

"এটা হয়তো মানা যেতে পারে।" মিতিন ঘাড় নাড়ল, "সময়টা মোটামুটি মিলছে। রানি ভিক্টোরিয়া মানে আঠারোশো আটান্ন। তার যদি পনেরো-বিশ বছর পরেও ফ্রান্সিস নুরপুর ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে তো এখন থেকে সওয়াশো বছরই হয়। ঠিক কিনা?"

"একদম ঠিক। খাপে-খাপ মিলে যাচ্ছে।"

"আমিও এই লাইনেই ভাবছিলাম। মনে হচ্ছে, এবার আলোর রেখা দেখতে পাচ্ছি।"

"রেখাটি সম্পর্কে অভাজন কি কিছু জানতে পারে?"

"ধৈর্য ধরো মহাশয়। অচিরেই সব প্রাঞ্জল হয়ে যাবে।"

বলতে-বলতে মিতিন মোবাইলের বোতাম টিপল। রিং-টোন বেজে উঠতেই কানে চাপল খুদে দূরভাষ যন্ত্রটি। ও প্রান্ত বোধ হয় ধরছে না, কেটে দিয়ে আবার চেষ্টা করল। এবারও ব্যর্থ। আস্তে-আস্তে ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে মিতিনের। চতুর্থ দফা প্রয়াস চালিয়ে ছেড়ে দিল। মোবাইলটা টুপুরকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "একটা দরকারি কল আসতে পারে। ধরে শুনে নিস কথাগুলো।"

"কার ফোন? কী কথা?"

"তুই জানিস।"

মিতিন উঠে বাথরুমে গেল। চোরা একটা উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে টুপুর। বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরতে হল না অবশ্য, মিনিট তিনেকের মধ্যেই মোবাইলে ঝংকার। মনিটরে নামটা দেখেই টুপুর শশব্যস্ত, "হ্যাঁ অনিশ্চয় আঙ্কল, বলুন?"

"মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে ছিল।" ওপারে অনিশ্চয় মজুমদারের ওজনদার গলা, "তোমার মাসির তো পরপর মিস্‌ড কল দেখছি।"

"হ্যাঁ, কাল রাত্তিরে মাসি আপনার কাছে একটা ইনফর্মেশন চেয়েছিল, সেই ব্যাপারেই...!"

"মাসি এখন কোথায়?"

"স্নানে ঢুকেছে। আপনি আমায় বলতে পারেন।"

"মিস ওয়াটসন?" অনিশ্চয় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসিটা থামতে প্রায় মিনিটখানেক সময় লাগল। তারপর হঠাৎই ভারী গলায় বললেন, "বেশ, শোনো তা হলে। কাল রাতেই আমি গেঁওখালি থানায় ফোন করেছিলাম। ওরা এখনও ডিটেল জানাতে পারেনি, তবে কিছু ফিডব্যাক দিয়েছে। যে ছেলে দু'টো নুরপুরে ধরা পড়েছিল...একজনের নাম তপন, অন্যজন বোধ হয় সফিকুল...দুই মূর্তিমানই দিনপনেরো হল বেপাত্তা।"

"মানে?"

"মানে গেঁওখালি ছেড়ে কোথাও পালিয়েছে। কোথায় আছে বাড়ির লোকও নাকি ঠিকঠাক বলতে পারেনি।"

"ও।"

"তোমার মাসিকে বোলো, থানায় আমার বলা আছে, ওরা ফিরলেই খবর পাওয়া যাবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কল।"

"তারপর...তোমরা আবার মীনধ্বজদার বাড়ি যাচ্ছ কবে?"

"ঠিক জানি না। মাসি বলতে পারবে।"

"আমাকে টাইম টু-টাইম কেসের ডেভেলপমেন্টটা জানাতে বোলো। আমি কিন্তু একটু চিন্তায় আছি। বেচারা বিদেশ থেকে এসে কী যে গাড্ডায় পড়ল...আমাদের হাতেও ব্যাপারটা ছাড়তে চাইল না!"

আপনমনে আরও একটুক্ষণ গজগজ করে ফোন কাটলেন

অনিশ্চয়। টুপুর বুঝে উঠতে পারল না, অনিশ্চয়ের সমাচারটা ভাল না খারাপ? ছেলে দু'টোকে জেরা না করলে কেসটা এগোতে কি অসুবিধে হবে মিতিনমাসির? ওরাই নাকি মিসিং লিঙ্ক! কিন্তু দু' মক্কেল পালালই বা কোথায়? কেন? অন্য কোনও গুপ্তধনের সন্ধানে পাড়ি দিল নাকি?

টুপুরের বিস্ময় অনেকটাই বুঝি বাকি ছিল। এমন একটা দুঃসংবাদ পেয়ে হতাশা তো দূরে থাক, মিতিনমাসি একটু চমকাল না পর্যন্ত! শুধু চোয়াল আরও শক্ত হল, চোখের মণি দু'-এক সেকেন্ড বুঝি স্থির, ব্যস। চুলটুল আঁচড়ে এসে আবার হাতে তুলল মোবাইল ফোন।

এবার মীনধ্বজ মর্মরবক্ষ বাগচী। অসম্ভব কেজো স্বরে মিতিন বলল, "গুপ্তধন রহস্য আমি সমাধান করে ফেলেছি। আমার চেকটা রেডি রাখবেন।"

...

"দাঁড়ান, উত্তেজিত হবেন না। যা বলছি আগে মন দিয়ে শুনুন। কাল দুপুর বারোটায় করুণা, সন্দীপন আর অনঙ্গমোহনকে অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকতে বলবেন। তাদের সামনেই আমি সুতোর জটটা খুলব।"

...

"না। এই মুহূর্তে আপনার কিছুই জানার প্রয়োজন নেই। বরং কিছু করণীয় আছে। এখন বাড়িতে ওই তিনজনের কেউ প্রেজেন্ট আছে কি?"

...

"শুধু করুণা? আপনি এক্ষুনি ছুটি দিয়ে দিন। সন্দীপন আর অনঙ্গমোহনবাবুকে ফোনে ইনফর্ম করুন, দু'জনের কারওরই আজ আর আপনার বাড়িতে আসার দরকার নেই। রাধামাধবের পূজার্চনা একদিন বন্ধ থাক। কারণটাও তিনজনকে জানিয়ে দেবেন। বাড়িটা এখন যে অবস্থায় আছে, আমি ঠিক সেই অবস্থাতেই কাল বাড়িটাকে

দেখতে চাই। অতএব কাল দুপুর বারোটার আগে কেউ যেন ও বাড়িতে পা না রাখে। যা বললাম, মুখস্থ করে নিন। অবিকল এই বাক্যগুলোই বলবেন সকলকে। একটি শব্দও বাদ না দিয়ে। গুপ্তধন-রহস্য ফাঁস করার জন্য আমিই যে তাদের ডাকছি, এটাও জানাতে ভুলবেন না।”

...

“আর-একটা কথা। আজ রাত্তিরটা চোখ আর গলাকে বিশ্রাম দিন। আপনার কম্পাউন্ডে কেউ ঢুকলেও টুঁ শব্দটি করবেন না। চেনা অচেনা কাউকে দেখলেও না। ভয় নেই, আপনার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা থাকছে।”

পার্থ আর টুপুর হাঁ করে কথাগুলো গিলছিল। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, কিছুই ঢুকছে না মগজে।

ফোনালাপ সেরে মিতিনের সরাসরি প্রশ্ন, “তোমরা আজ সারারাত জাগতে পারবে?”

পার্থ-টুপুর কোরাসে বেজে উঠল, “আমরা? কেন?”

“নো কোয়েশ্চেন। জবাব চাইছি। পারবে?”

চোখ চাওয়াচাওয়ি করল পার্থ-টুপুর। কী হেঁয়ালি রে বাবা!

রাত তখন দু'টো দশ। নুরপুরের পথঘাট পুরোপুরি শুনশান। রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাদা। একটা জিপ প্রায় নিঃশব্দে উঠে এল বাঁধের রাস্তায়। হেডলাইট না জ্বালিয়ে। নিন্‌হোর খানিক আগে থামল সহসা। পরপর পাঁচটা লোক নামল গাড়ি থেকে। এগোল সতর্ক ভঙ্গিতে।

নিন্‌হোর গেটে এসে সামনের লোকটা একগোছা চাবি বের করল।

ছোট্ট শব্দ, খুলে গেল তালা। ফটক সামান্য ফাঁক করে একে-একে ঢুকে পড়ল পাঁচমূর্তি। প্রত্যেকেরই পায়ে রবার সোলের জুতো, তবু নুড়িপাথরে হাঁটতে গিয়ে আওয়াজ বাজছে মৃদু-মৃদু। গোটা কম্পাউন্ড এখন অন্ধকার। চওড়া বারান্দায় একখানা বাল্‌ব জ্বলছে বটে, তবে তার দ্যুতি সিঁড়ির নীচ পর্যন্ত যেন পৌঁছচ্ছে না। গাঢ় আবছায়ায় লোকগুলোকে কেমন আধিভৌতিক লাগছে।

অ্যাসবেস্টস ছাওয়া গ্যারাজটার কাছাকাছি এসে সামনের লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। কিছু শুনল কি? নাকি মনের ভুল? সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল এদিক-ওদিক। মীনধ্বজের গাড়িখানাকে দেখল ঝলক। আস্তে-আস্তে মিলিয়ে এল ভুরুর ভাঁজ, আবার এগোল। সোজা বেসমেন্টের দরজায় পৌঁছে অভ্যস্ত হাতে চাবি ঘোরাল তালায়। হাতের ইশারায় ডাকল সঙ্গীদের। পরপর পাঁচজন সেঁধিয়ে গেল বেসমেন্টে।

দশ মিনিট। কুড়ি মিনিট। তিরিশ মিনিট। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নিঝুম পুরীর গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল লোকগুলো। চারজনের মাথায় ভারী কাঠের বাক্স, পঞ্চমজনের কাঁধে বড়সড় এক ঝোলা। সেই ঝোলাধারীই ফের বন্ধ করল বেসমেন্ট।

ঠিক তখনই এক তীব্র আলোর ঝলকানি। পাঁচ সেলের টর্চের জোরালো রশ্মি আছড়ে পড়ল লোকটার মুখে। টর্চের পিছন থেকে মিতিনের গলা গর্জে উঠল, "আপনার কারিকুরি, জারিজুরি, সব শেষ সন্দীপন। উঁহু, একটুও নড়ার চেষ্টা করবেন না। আমার রিভলবার কিন্তু লোডেড এবং আমি টার্গেট মিস করি না।"

ঘটনার আকস্মিকতায় সন্দীপন হতচকিত। দাঁড়িয়ে পড়ল স্থাণুবৎ। বাকি চারজন বাক্স ফেলে ফটকের দিকে দৌড়তে যাচ্ছিল, মিতিন এবার তাদের উদ্দেশে হুংকার ছুড়ল, "পালাবার পথ নেই। পুলিশ গোটা বাড়িটাই ঘিরে ফেলেছে। যদি চুপচাপ ধরা দেন তো ভাল, নইলে এক্ষুনি পুলিশ শুট করবে।"

সত্যি-সত্যিই ডজনদুয়েক পুলিশ যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল। কম্পাউন্ডেই গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল তারা। ঝকঝকে চেহারার এক তরুণ অফিসার সপ্রতিভ স্বরে বলল, "এবার তা হলে হ্যান্ডকাফ পরাই ম্যাডাম?"

"এক্ষুনি। একটুও দেরি করবেন না। পাখির বাসা থেকে একটা পাখিও যেন উড়ে যেতে না পারে। আগে পালের গোদাটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধুন। ওর মগজটা শয়তানিতে গিজগিজ করছে। ও কিন্তু ভয়ংকর বিপজ্জনক ক্রিমিনাল।"

"কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না ম্যাডাম।" সন্দীপন গরগর করে বলে উঠল, "ভবিষ্যতে আপনার কপালে খুব বড় বিপদ আছে।"

"নিজের বর্তমানটা তো আগে সামলান। অন্তত দশ বছর জেলের ঘানি তো ঘুরিয়ে আসুন। যদি গরাদের ওপার থেকে বেরোতে পারেন, তখন নয় আবার মোকাবিলা করা যাবে।"

সন্দীপন ফের তড়পে উঠতে যাচ্ছিল, পুলিশ অফিসার দাবড়ে থামালেন তাকে। হাতকড়া পরালেন। পার্থ-টুপুরও বেরিয়ে এল মীনধ্বজের গাড়ির পিছন থেকে। জুলজুল চোখে দেখল সন্দীপনকে। অস্ফুটে বলল, "কিন্তু ও ব্যাটার ক্রাইমটা কী? বাক্সগুলোয় গুপ্তধন আছে বুঝি?"

"এতক্ষণ কষ্ট করলে, আর-একটু ধৈর্য ধরো। বাড়ির মালিকের সামনেই বাক্স খোলা হোক।"

হ্যাঁ, পার্থ-টুপুর কম কষ্ট করেনি। সেই রাত সাড়ে ন'টায় পৌঁছেছিল ফলতায়। অনিশ্চয় মজুমদারের নির্দেশে একখানা ভুটভুটি তৈরি ছিল ফেরিঘাটে, তাতে চড়ে এগারোটায় নুরপুর। তারপর চোর-ছ্যাঁচোড়ের মতো পিছনের ফটক টপকে গুটিগুটি পায়ে মীনধ্বজের গ্যারাজ। তখন থেকে টানা তিনঘণ্টা ঘাপটি মেরে বসে ছিল ঢাউস গাড়িটার আড়ালে। ইয়া-ইয়া মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ দাগড়া-দাগড়া, তবু মুখে শব্দটি করার

জো নেই, এতটুকু নড়াচড়াও নিষিদ্ধ। এ যে কী যমযন্ত্রণা! তা যাই হোক, কষ্ট করে কেষ্ট না পাক, সন্দীপন তো মিলেছে। এবার ক্লাইম্যাক্স তো দেখতেই হয়।

মিতিনের ডাক পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছেন মীনধ্বজ। হঠাৎ বাড়িতে এত পুলিশটুলিশ, লোকজন দেখে প্রথমটায় তাঁর কেমন বেভুল দশা। সন্দীপনের হাতকড়াটি পর্যন্ত খেয়াল করেননি। তাকেই জিজ্ঞেস করে বসলেন, "অ্যাই, কী হয়েছে? এখন এত ভিড় কেন?"

সন্দীপন এক ঝটকায় মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মিতিন হেসে বলল, "ও আপনাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে মিস্টার বাগচী!"

"কেন?"

"এমন মহৎ কাজকর্ম করছিল...আপনার বাড়িটাকে গোডাউন বানিয়ে...!"

"মানে?"

"মানে এই বাক্সগুলোয় আছে। স্বচক্ষেই দেখুন।"

তরুণ পুলিশ অফিসারটি একটার পর-একটা বাক্স খুলছেন। অন্দরের বস্তুগুলোকে দেখে, শুধু মীনধ্বজ কেন, সকলেরই আক্কেল গুড়ুম। ডজন-ডজন রিভলবার! স্বয়ংক্রিয় রাইফেল! খানতিনেক মিনি রকেট লঞ্চার! অজস্র কার্তুজ, শেল, গ্রেনেড! সন্দীপনের ঝোলা থেকেও বেরোল বেশ কিছু জিনিস। দিশি পিস্তল, পাইপগান, গুলি...।

টুপুরের স্বর ঠিকরে উঠল, "এ যে একখানা আস্ত অস্ত্রাগার!"

"সেই জন্যই তো বলছি, উনি মহৎ কর্মে লিপ্ত ছিলেন! বিদেশ থেকে চালান হয়ে আসা অস্ত্র যেসব গুণধরদের মাধ্যমে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, শ্রীমান সন্দীপন তাদেরই একজন। সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গও আছে। তপন, সফিকুল, তারপর এই আরও চার পিস...।"

"কী সর্বনাশ! সন্দীপনকে আমি এত বিশ্বাস করতাম...!" মীনধ্বজ

হায়-হায় করে উঠলেন, "আমার বাড়িতে এই কারবার চালাত? কোথায় রাখা ছিল এসব?"

"রাত্তিরবেলাতেই দেখবেন? চলুন তা হলে।"

পাঁচ মক্কেলকে পুলিশভ্যানে তুলে দিয়ে অফিসারটিও মিতিনদের সঙ্গ নিলেন। বেসমেন্টে ঢুকল মিতিন। টর্চের আলো পথ দেখাচ্ছে। প্রথম ঘর দু'টো পেরিয়ে তিন নম্বরটিতে এসে মিতিন বলল, "আপনি কি জানেন, এ বাড়িতে একটা পাতালপুরী আছে?"

মীনধ্বজ বললেন, "আমরা তো সেখানেই দাঁড়িয়ে।"

"উঁহু, এ তো মর্ত্যধাম। পাতালপুরী আরও নীচে।" অন্ধকারে মিতিনের গলা কেমন অন্যরকম শোনাল, "আমরা এখন পাতালপুরীর খিড়কি দরজায় মিস্টার বাগচী।"

"কই, কোথায় দরজা? ওদিকে তো শুধু বেসমেন্টের চাতালে নামার...!"

"ওটি ছাড়াও এ ঘরে আর-একটি দরজা আছে। আরও নীচে নামার।" বলতে-বলতে মিতিন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর বিশাল তৈলচিত্রটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছবিটাকে ঠেলে বাঁয়ে সরাতেই বেরিয়ে পড়ল এক গহ্বর। অন্ধকারে গর্তটা যেন হাঁ হাঁ করছে।

মিতিন গহ্বরের মুখটায় আলো ফেলল, "আসুন, দেখুন, এখান থেকে কীভাবে লোহার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে! অনেকটা নীচ পর্যন্ত!"

টুপুর বিস্ময়ের প্রান্তসীমায়। অন্তত পঁচিশ-তিরিশ ফুট নেমেছে ঘোরানো সিঁড়ি! তলায় শুধু আঁধারই আঁধার!

একে-একে সবাই নামছেন সিঁড়ি বেয়ে। খুব সাবধানে। মাঝামাঝি পৌঁছতেই পরপর লোহার বাঙ্ক। একটা-দু'টো নয়, অজস্র। কম করে তিরিশ-চল্লিশটা তো হবেই। সিঁড়ি থেকে বাঙ্কে যাওয়ার রাস্তাও আছে। সরু সরু। তিন-সাড়ে তিন ফুটের বেশি উঁচু নয় বাঙ্কগুলো, কিন্তু অনেকটাই গভীর।

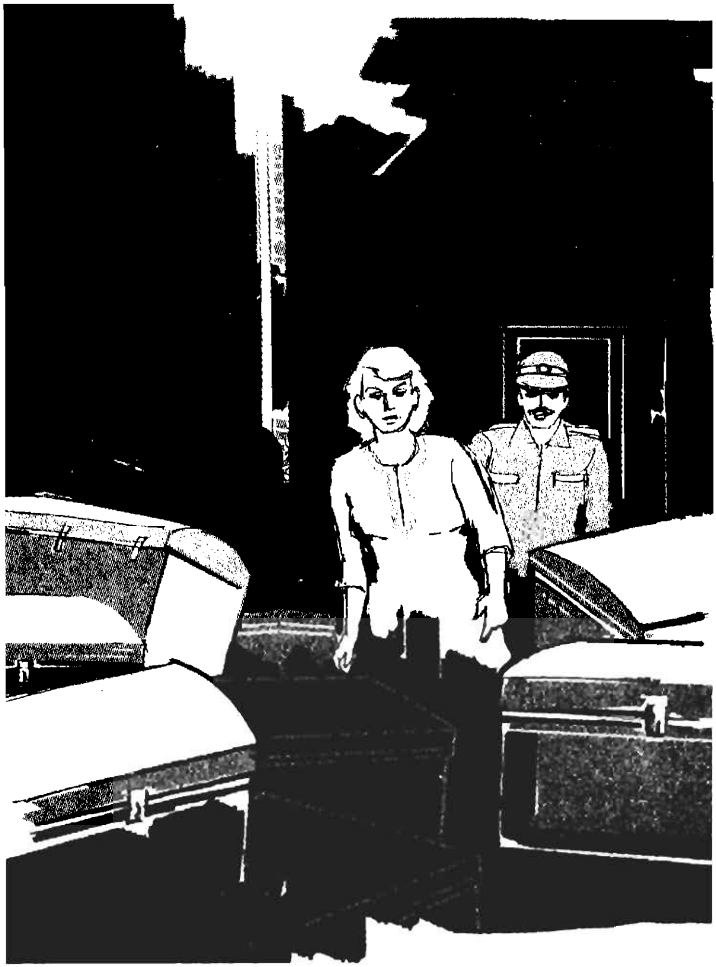

টর্চ মেরে-মেরে বাঙ্কের ভিতরগুলো দেখছিল মিতিন। বলল, "বেবাক ফাঁকা। সব ক'টা বাক্সই বের করে নিয়েছে।"

মীনধ্বজ হতবাক মুখে বললেন, "বাড়ির তলায় এরকম সাংঘাতিক সব ব্যবস্থা আছে আমি জানতামই না!"

"আপনার বাবা-ঠাকুরদাও অবগত ছিলেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত সিংহধ্বজবাবুই ওই প্রকাণ্ড ছবিটি দিয়ে দরজাটাকে পাকাপাকিভাবে আড়াল করে দেন।"

"কেন?"

"কারণ, এই দরজাই তো একটা কুৎসিত অধ্যায়ের স্মৃতি বহন করছে।"

"কী হত এখানে?"

"অন্ধকারে দাঁড়িয়েই অন্ধকারের কাহিনি শুনবেন?" মিতিন টর্চের আলো ঘোরাল, "তার চেয়ে চলুন উপরে, আপনার লিভিংরুমে গিয়ে বসি।"

দিনের আলো ফুটতে না-ফুটতে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন অনিশ্চয়। অস্ত্র উদ্ধারের নাম শুনেই প্রায় উড়তে-উড়তে চলে এসেছেন নুরপুরে। দ্রুত ঘুরে এলেন পাতালপুরী। একদম তলা পর্যন্ত সরেজমিন করে উপরে উঠে হাঁপালেন কিছুক্ষণ। তার পরেই গলায় বিলাপ ঝরে পড়ল, "ও হো হো, আর্মস স্মাগলিংয়ের কেসেও আপনি পুলিশকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন?"

মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "কিছু মনে করবেন না অনিশ্চয়দা, পুলিশের যা কর্মতৎপরতা, তাদের কাছে হারা কিন্তু খুব কঠিন।"

"যা খুশি টিজ করে যান! আমাদের তো এখন প্রতিবাদের মুখ নেই।" ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন অনিশ্চয়, "তবে ক্রিমিনালদেরও ব্রেনের তারিফ করতে হয়। জিনিসগুলো রাখার জন্য এমন একখানা জায়গা সেট করেছে...!"

"ওই বাঙ্কগুলো কিন্তু সন্দীপনদের তৈরি নয়। ওগুলোর নির্মাতা তো বেসিল ডি অল্‌মিডা।"

"তিনি কে?"

"ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডার বাবা। ঠাকুরদাও হতে পারেন। ওই ফ্রান্সিস ডি অল্‌মিডার কাছ থেকেই বাগচীপরিবার এই বাড়িটি কিনেছিলেন। বেসিল ডি অল্‌মিডা ছিলেন একজন পর্তুগিজ হার্মাদ এবং দাসব্যবসায়ী। গ্রামগঞ্জ থেকে ছেলেবুড়োদের ধরে এনে ওই অন্ধকূপের মতো বাঙ্কগুলোয় পুরে রাখতেন। জাহাজের খোল ভর্তি করার মতো লোক সংগ্রহ হয়ে গেলেই পত্রপাঠ চালান করতেন সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে। বিনিময়ে মিলত ঘড়া-ঘড়া মোহর।"

করুণা এখনও আসেনি। মীনধ্বজ নিজেই কফি বানিয়ে এনেছেন। ট্রে-খানা টেবিলে রাখতে-রাখতে বললেন, "এখন বুঝতে পারছি গুপ্তধনের গুজব চাউর হওয়ার কারণ কী।"

"যা রটে তার কিছু তো বটে।" মিতিন হাতে কফিমগ তুলল, "সিংহধ্বজবাবু ওই ঘড়া-ঘড়া মোহরের গল্পই করেছিলেন ভুজঙ্গমোহনকে। সম্ভবত গুপ্ত দরজার সংবাদটিও ভুজঙ্গমোহনের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু সিংহধ্বজবাবুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে ভেবে কাউকেই ওই গোপন দরজাটির কথা তিনি জানাননি। এমনকী, দাসব্যবসার কথাও নয়। তাতে হয়তো বাগচীবাড়িরও দুর্নাম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে খানিক হেঁয়ালি করেছেন। ফলে মাটির তলায় মাটি, তার তলে ঘড়া-ঘড়া মোহর...! এমন একটি গুজব ক্রমে-ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে।"

অনিশ্চয় প্রাজ্ঞস্বরে বললেন, "ওই রিউমার থেকেই কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারের কথা আপনার মাথায় আসা উচিত ছিল মীনধ্বজদা।"

"আরে ভাই, আন্ডারগ্রাউন্ড মানে আমরা তো চিরকালই জানি, বেসমেন্ট আর বেসমেন্টের চাতাল। লকগেট খুললে নাকি চাতাল পর্যন্ত জল এসে যেত। তারপর আর-একটি আউটলেট দিয়ে তা বের করেও দেওয়া হত। অবশ্য সবই শোনা গল্প। আমার ঠাকুরদা তো কবেই পাঁচিল তুলে চাতালে জল আসাযাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।"

"নিন্‌হোয় জল ঢোকা কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি মিস্টার বাগচী। ওই জলপথেই এ বাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র ঢোকানো হয়েছে।"

"কীভাবে? কীভাবে?" অনিশ্চয় খাড়া হয়ে বসলেন।

"তা হলে একটু পিছন থেকে শুরু করি। অল্‌মিডাদের সময়ে লকগেট ছিল তিন-তিনখানা। জলের চাপ কমাতেই গেটগুলো ব্যবহার হত বটে, তবে যাদের ধরে আনছে, তারা যাতে কোনওভাবেই নদীতে পালাতে না পারে তার জন্যও ছিল ওই তিন ধাপের গারদ। কোনও কারণে হু হু করে জল বেড়ে গেলে গোটা পাতালপুরী ভর্তি হয়ে জল উঠে পড়ত বেসমেন্টের চাতালে। তখন বাঙ্ক থেকে বের করে বেসমেন্টের ঘরগুলোয় রাখা হত বন্দি মানুষগুলোকে। আর যখন চালানের প্রয়োজন হত, লকগেটগুলো খুলে, ক্যানালে জল ঢুকিয়ে, নৌকোয় করে নদীতে আনা হত, অর্থাৎ অল্‌মিডাদের জাহাজঘাটায়। শিখিধ্বজ বাড়িটা কেনার পর ক্রমে-ক্রমে জাহাজঘাটা এবং দু'খানা লকগেট পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তখন হয়তো কোনও বড় ঘূর্ণিঝড়টড়ও হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, হয়েছিল তো!" পার্থ বাইরে থেকে একরাশ শিঙাড়া-জিলিপি কিনে এনেছে। গরম শিঙাড়ায় কামড় বসিয়ে বলল, "অরুণাভর বাড়িতে তো কাল দেখছিলাম। আঠারোশো তিরানব্বইতে একটা জোর সাইক্লোন হয়েছিল এই এলাকায়।"

"তবে তো ওই ঝড়েই...।" মিতিন পার্থর কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে বলল, "যাই হোক, থার্ড গেটটা টিকে গিয়েছিল কোনও মতে। কিন্তু আর ব্যবহার হয়নি। সিংহধ্বজবাবু গুপ্ত দরজাটি ছবি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার পর পাতালপুরীটিও পাকাপাকিভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। পরে মীনধ্বজবাবুর ঠাকুরদা বজ্রধ্বজবাবু আর কোনওরকম ঝুঁকিতেই যেতে চাননি। পাছে ওই লকগেটখানা ভেঙে কোনওভাবে জল ঢুকে পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি চাতালেও পাঁচিল তুলে দেন। অতএব লকগেট অধ্যায়ের ওখানেই পরিসমাপ্তি হওয়ার কথা।"

"কিন্তু তা হল না।" অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর টুপুর বলে উঠল, "সন্দীপনবাবু লকগেটখানা পরিষ্কার করে আবার ব্যবহারযোগ্য করে তুললেন।"

"ঠিক তাই। কারণ, এ বাড়িতে একা থাকার সময় সে আবিষ্কার করে ফেলেছে, কীভাবে লকগেট খোলা যায়। একই সঙ্গে সে বের করে ফেলেছে পাতালপুরীতে ঢোকার রাস্তা। তারপরেই আর্মস ডিলারদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। তলে-তলে নিজস্ব একটা দলও তৈরি করে নেয় সে। রাতে জোয়ারের সময় লকগেট খুলে দেয়, টুক করে অস্ত্র সমেত স্পিডবোট ঢুকে পড়ে পাতালপুরীতে। অস্ত্র বেরনোরও একই পন্থা। তবে স্থলপথেও পাচার হয় অস্ত্রের পেটি। ভায়া গুপ্ত দরজা।"

"এবং তাকে তো সন্দেহ করারও কেউ নেই।" পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "ফাঁকা বাড়িতে তো শ্রীমান সন্দীপন একাই অধীশ্বর।"

টুপুর বলল, "তা কেন? অনঙ্গমোহনবাবু তো আসতেন দু'বেলা। তিনি কি কিছুই আঁচ করতে পারেননি?"

"কী করে করবেন? প্রথমত, তাঁর যাতায়াত একটা নির্দিষ্ট টাইমে। আর সেই সময়টিতে তো সন্দীপন লক্ষ্মী ছেলে। দ্বিতীয়ত, অনঙ্গমোহনবাবুর সঙ্গে ব্যবহারটিও অত্যন্ত মধুর রেখেছে সন্দীপন। তা ছাড়া অনঙ্গমোহন তো বহু সময়ই নেশার ঘোরে থাকেন!"

"হুঁ। মীনধ্বজবাবু এসে পড়াতেই সন্দীপনের মুশকিল হল।"

"শুধু মুশকিল কী রে? বল সাড়ে সর্বনাশ। মীনধ্বজবাবু পার্মানেন্টলি থাকাই শুরু করলেন তা নয়, সন্দীপনকেও বাড়ি থেকে আউট করে দিলেন। ফলে সন্দীপনেরও ছটফটানি বাড়ছিল। কারণ, এই ধরনের নিষিদ্ধ মাল তো রোজ-রোজ আসে না, দু'মাস, চারমাস পরপর হয়তো কোনও জাহাজে চোরাগোপ্তা এল। সমুদ্র থেকে সেই অস্ত্র স্পিডবোট বা নৌকোয় করে ঢোকে সন্দীপনদের মতো এজেন্টদের ঘরে। মীনধ্বজবাবু দেশে ফেরার পরেও সন্দীপনের কাছে এরকম একটা কনসাইনমেন্ট এসেছিল। ঝুঁকি নিয়ে পাতালপুরীতে পেটিগুলো ঢুকিয়েও ফেলেছিল সন্দীপন। প্ল্যান ছিল, এবার কারবারটা কিছুদিন বন্ধ রাখবে। পাছে মীনধ্বজবাবুর কোনওভাবে খটকা জাগে, তাই লকগেট খোলা-বন্ধের ব্যবস্থাটাও সাময়িকভাবে অকেজো করে দিয়েছিল। আর সেই কম্মোটি করতে গিয়েই বিপত্তি। যা ভয় পাচ্ছিল, তাই হল, মীনধ্বজবাবু দেখে ফেললেন।"

মীনধ্বজ হতবাক স্বরে বললেন, "আমি আবার কী দেখলাম?"

"ওই যে দু'টো চোর...মাটি খোঁড়া...!"

"লকগেট বিকল করার জন্য ওরা মাটি খুঁড়ছিল?"

"ওটাই তো ভ্রান্তি। দৃষ্টিবিভ্রম। দূর থেকে যখন আপনি দেখছেন, তখন মাটি খোঁড়া হচ্ছে না বোজানো চলছে, তা কি আপনার পক্ষে বোঝা সম্ভব?"

মীনধ্বজবাবু কেমন ভ্যাবাচ্যাকা মুখে তাকিয়ে। চশমার কাচের পিছনে বড়-বড় চোখ দু'খানা যেন আরও বিস্ফারিত। তোতলানো গলায় বললেন, "ম্-ম্-মাটি খোঁড়া হচ্ছিল না?"

"উঁহু। উলটো কাজটাই তপনরা করছিল তখন। আপনার সন্দীপনের নির্দেশ মতো।"

"ওরা কী বোজাচ্ছিল?"

"আহা, ওইখানটাতেই তো লকগেটের প্রাণভোমরা। পাথরের নীচটায়। আমার হিসেব বলছে, ওখানেই আছে লকগেট খোলা-বন্ধ করার মূল হাতলখানা। ওই হাতল থেকেই মোটা লোহার তার খাড়া নেমেছে পাতালপুরীতে। সেখানে পুলিতে পাক খেয়ে লম্বভাবে তার পৌঁছেছে লকগেটে। পাথর সরিয়ে হ্যান্ডেলটা ঘোরালেই লকগেট খুলে যাবে।"

"কী কাণ্ড! যত শুনছি, ততই শিহরিত হচ্ছি।"

"চিরকাল চোখের সামনে পড়ে থাকা জিনিসে আমাদের কৌতূহল থাকে না মিস্টার বাগচী। তবে হ্যাঁ, ইদানীং তো পরিস্থিতির কিছু বদল ঘটেছিল। ওই জগদ্দল পাথর আর অনড় অবস্থায় ছিল না। নিয়মিত সরানো হয় বলে আলগা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এবার আপনার কৌতূহল জাগতেও পারত।"

"কিন্তু আমি সত্যিই কিছু খেয়াল করিনি ম্যাডাম!"

"হতে পারে। তবে যার মনে পাপ, সে তো ভয় পাবেই। এবং তাকে সাবধানও হতে হবে। অবশ্য একটা কথা মানছি, সন্দীপনের উপস্থিতবুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। পরিস্থিতি ম্যানেজ করার জন্য সুচতুরভাবে নিজেই ছেলে দু'টোকে পাকড়াও করেছে। আর তারাও সন্দীপনের শিক্ষা মোতাবেক গুপ্তধনের হুজুগটা আউড়ে গিয়েছে পুলিশের কাছে। কিন্তু ধর্মের কল যে বাতাসে নড়ে! ওই গুজবই যে সন্দীপনকে গাড্ডায় ফেলে দেবে, এটা সন্দীপন ভাবতেও পারেনি।"

"কী গাড্ডা?"

"ওই যে...গুপ্তধন নিয়ে হইচই, ভিড়ভাট্টা, নিউজ চ্যানেল...। হট্টগোলের মাঝে বেচারা সন্দীপনের কারবারের নাভিশ্বাস। অগত্যা বেচারা আপনাকে অনেক ভয় দেখানোর চেষ্টা করল। রাত্তিরে চুপিসারে বেসমেন্টে ঢুকে নানানরকম সাউন্ডের টেপ চালাত। হ্যাঁ, সেই কারণেই সন্দীপন সামনে থাকলে আপনি ভৌতিক শব্দ কখনও শোনেননি।" মিতিন সোফায় হেলান দিল, "আপনি যে ভূতের ভয়েও তেমন কাবু

হলেন না, এটাও সন্দীপনের দুর্ভাগ্য। এদিকে পাতালপুরীতে জমে থাকা জিনিসগুলো ডেলিভারির তাগাদা আসছে, সন্দীপন ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠছে। জিনিস পাচারের জন্য ইটভাঁটার পাঁচিল দিয়ে দু'টো লোক নামাল, আপনি দেখে ফেললেন। স্পিডবোটে পাঁচজন এল, তাও আপনার নজরে পড়ে গেল।"

অনিশ্চয় গোঁফ মোচড়াতে-মোচড়াতে গিলছিলেন কথাগুলো। হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, "আপনি যা বলছেন ম্যাডাম, তাতে তো অ্যাদ্দিনে মীনধ্বজদার সাবাড় হয়ে যাওয়ার কথা। আস্ত মানুষটা হাপিস হয়ে গেলেই বা কী করার ছিল?"

"উঁহু। তাতে একটু সমস্যা ছিল বইকী। মীনধ্বজবাবুকে খুনই করুক কি লোপাট, চাঞ্চল্য তো একটা হবেই। কলকাতার আত্মীয়স্বজনরা আসবে, ছেলেমেয়েরাও এসে পড়বে...। আর সবচেয়ে বড় ঝামেলা তো আপনি। আই জি সাহেব যে একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না, এটাও তো সন্দীপনকে মাথায় রাখতে হয়েছে। অতএব সব মিলিয়ে যে চাপ সৃষ্টি হবে, তাতে সন্দীপনের কারবারের চিরতরে বারোটা। এমনকী, তার গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং কোনওক্রমে এবারের কনসাইনমেন্টটা বিনা ঝঞ্ঝাটে পার করে দেওয়াটা তো বেশি জরুরি। মীনধ্বজবাবু সেপ্টেম্বরে বিদেশে গেলে আবার নয় ক'দিন ব্যাবসাটা চালাত।" মিতিন একটু থামল। আড়চোখে মীনধ্বজকে দেখে নিয়ে বলল, "অবশ্য শেষ পর্যন্ত যে মেরে ফেলত না, সে গ্যারান্টিও কিন্তু নেই। কারণ, আমদানি করা পেটিগুলো সন্দীপনকে বের করতেই হত। আর পৌঁছে দিতে হত যথাস্থানে। নইলে সন্দীপন তো নিজেই ঘ্যাচাং ফু হয়ে যাবে।"

"বটেই তো। ওই ব্যবসা সাংঘাতিক খতরনাক। লাখ-লাখ টাকা উপার্জন হয় ঠিকই, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সামনে খাঁড়া। সামান্য বেগড়বাঁই করলেই জান খতম।"

"একবার লাইনে পা রাখলে বেরিয়ে আসারও তো উপায় নেই।" পার্থ রুমালে মুখ মুছল, "একেই বলে শাঁখের করাত। আসতে কাটে, যেতেও কাটে।"

মীনধ্বজ করুণ মুখে বললেন, "আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না, সন্দীপনের মতো ভদ্র, শিক্ষিত ছেলে কী করে দেশদ্রোহীদের খাতায় নাম লেখাল?"

"দুষ্কর্মের জন্য সম্ভাবনাময় এমন একটা নিরালা বাড়িতে একটি ইয়াং ছেলে একা বাস করছে..., দেখে নিশ্চয়ই কোনও ওস্তাদ ছিপ ফেলেছিল। চারের সঙ্গে বঁড়শিও বিঁধে গিয়েছে গলায়, আপনার সন্দীপন হাঁসফাঁস করছে এখন।"

"বেচারার লাইফটাই বরবাদ হয়ে গেল।"

"সেই টোপ দেনেওয়ালাকেও আমি ছাড়ছি না। ছোকরার পেট থেকে সব ক'টা নাম টেনে বের করব।" মুঠো ঝাঁকিয়ে ঘোষণা করলেন অনিশ্চয়, "যদি ভালয়-ভালয় সব স্বীকার করে রাজসাক্ষী হয়, তো আবার সুস্থজীবনে ফিরলেও ফিরতে পারে।"

মিতিন চুপচাপ আলোচনা শুনছিল। হাত বাড়িয়ে ভ্যানিটিব্যাগখানা টানল কাছে। কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বলল, "এবার তো আমাদের উঠতে হয় মিস্টার বাগচী।"

মীনধ্বজ ব্যস্তভাবে বললেন, "সে কী? এক্ষুনি যাবেন? রাতভর পরিশ্রম গেল, একটু বিশ্রামটিশ্রাম নিয়ে...!"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। একেবারে বাড়ি গিয়েই রেস্ট নেব।"

"ওকে। ফিজটা তো অন্তত নিয়ে যাবেন।" মীনধ্বজ উঠে দাঁড়ালেন, "এক সেকেন্ড। চেকবইটা নিয়ে আসি।"

লম্বা-লম্বা পায়ে দোতলায় গেলেন মীনধ্বজ। অনিশ্চয় গা-ঝাড়া দিয়ে বললেন, "চলুন, আমিও রওনা দিই। একবার শুধু থানাটা ছুঁয়ে যাব। তারপর চারজনে একসঙ্গে গল্প করতে-করতে...!"

"পুলিশের গাড়িতে ফিরব?" পার্থর পুটুস টিপ্পনী।

অনিশ্চয় ভুরু কুঁচকে বললেন, "কেন, পুলিশের গাড়িতে কী অসুবিধে?"

"না, মানে শুনেছি, পুলিশের গাড়িতে ওঠাটা নিজের হাতে, কিন্তু নামাটা...! অনেক সময় নাকি নামতে-নামতে ছ'মাস, এক বছরও লেগে যায়!"

অনিশ্চয় দম ছেড়ে হেসে উঠলেন। দুলে-দুলে হাসলেন, হাসিতে সর্বাঙ্গ কেঁপে-কেঁপে উঠল। ঘরের গুরুগম্ভীর আবহাওয়া তরল হয়ে গেল যেন।

মীনধ্বজ ফিরলেন। হাতের সাদা খামখানা মিতিনকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আর একটা-দু'টো প্রশ্ন করব?"

"বলুন?"

"করুণা আর অনঙ্গকে কি কাজে বহাল রাখতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে! সন্দীপন ওদের হাতে রেখেছিল, তবে পলিউট করতে পারেনি।"

"আপনার তদন্তে আমি মুগ্ধ। কিন্তু, রহস্য উদ্ঘাটনের সূত্রগুলো আপনি কী করে এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলেন যদি জানতে পারি? নিছকই কৌতূহল!"

খামখানা ব্যাগে ঢুকিয়ে মিতিন ভাবল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল, "আমি শুধু চারটে সুতো জোড়া লাগিয়েছি। পাথর, বস্তা, বেসমেন্টের প্যাসেজের লেন্থ, বাড়ির উচ্চতা।"

মীনধ্বজ ফ্যালফ্যাল তাকালেন, "বুঝলাম না।"

"একটা ভারী পাথর দীর্ঘকাল মাটিতে গাঁথা থাকলে যে পরিমাণ শ্যাওলা জমা উচিত, এমনটি ছিল না। অর্থাৎ পাথর মাঝে-মাঝেই সরানো হত। তারপর পাঁচিলের ওপারে পেলাম দু'খানা মাটির বস্তা। ইটভাঁটায় বস্তা করে মাটি আসে না। ওরা পাড়ের মাটিই কাটে, অথবা

নৌকো বোঝাই মাটি কেনে। তখনই বুঝেছিলাম তপনরা বস্তা বোঝাই মাটি এনেছিল হ্যান্ডেলের জায়গাটা বোজাতে। সন্দীপন বস্তা দু'টো পাঁচিলের ওপারে ফেলে দেয়। মোরওভার, গর্ত যদি খোঁড়াই হয়ে থাকে, তবে সেই মাটি দিয়ে গর্ত পুরো বুজবে না, দুরমুশ করতে আরও মাটি লাগবে। তখনই নিশ্চিত হলাম, গর্ত খোঁড়াই হয়নি। তিন নম্বর, আপনার বেসমেন্টের প্যাসেজের দৈর্ঘ্য, আই মিন যেখানে তিনটে ঘর আছে, আপনার বাড়ির দৈর্ঘ্যের চেয়ে অন্তত তিরিশ ফুট কম। ওই শূন্যস্থানটুকু তা হলে কোথায়? তৃতীয় ঘরের গুপ্ত দরজাই এর একমাত্র সমাধান। এবার আসি আপনার বাড়ির উচ্চতায়। নদী থেকে লকগেট সমেত বাড়িটা যত উঁচু হওয়া উচিত, বাড়ির বেসমেন্ট আর উপরের অংশ মিলিয়ে তার চেয়ে অনেক কম। অতএব একটা পাতালপুরী থাকতেই পারে। এই সিম্পল ব্যাপারগুলো যে কেন আপনারা লক্ষ করেননি! সন্দীপন তো মনে হয় এগুলো থেকেই...!"

মীনধ্বজ মোহিত হয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিতিন-পার্থ অনিশ্চয়ের গাড়িতে গিয়ে উঠল। পাদানিতে পা রেখেও টুপুর হঠাৎ থমকাল। বলল, "দু' মিনিট। আমি এক্ষুনি আসছি।"

বলেই ছুটতে-ছুটতে সোজা গঙ্গার পাড়। প্রভাতী আলোয় কী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে নদীকে!

প্রায় দু'শো বছর ধরে কত কিছু ঘটে গিয়েছে এ বাড়িতে। সেই অল্‌মিডাদের সময় হাজার-হাজার মানুষের কান্না, বাগচীপরিবারের আয়েশি জীবন, শেষমেশ সন্দীপনের এই ভয়ংকর কার্যকলাপ— বহতা নদী সবই দেখেছে, তবু কেমন বয়ে চলেছে উদাসীন!

আপনাআপনি একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল টুপুরের। কার জন্য কে জানে!

---

9 788177 568813